ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ।। ১৬ চৈত্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৩০ মার্চ, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

অন্তর্বর্তী বাজেটেও মুসলিম তোষণ

সংখ্যালঘু উন্নয়ণে ৫২৫ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেবলমাত্র মুসলিমদের উন্নয়ণের জন্য রাজ্য বাজেটে ৫২৫ কোটি টাকার প্রস্তাব পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। দেশের কোনও

বাজেট পেশ করছেন অসীম দাশগুপ্ত

রাজ্যে মুসলিমদের জন্য এভাবে রাজকোষের দরজা খুলে দেওয়া হয়নি। বেতন বৃদ্ধির ধাক্কায় যেখানে রাজ্যের সামাজিক উন্নয়ণ সংক্রান্ত দপ্তরগুলির বাজেট বরাদ্দ সেভাবে বাড়েনি, সেখানে সংখ্যালঘু উন্নয়ণ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ এক ধাক্কায় প্রায় ২৫০ কোটি টাকা বাড়িয়েছে সিপিএম সরকার। গতবারও একইভাবে মুসলিমদের উন্নয়ণে বাজেট বরাদ্দ চার গুণ বাড়ানো হয়েছিল। মুসলিমদের জন্য দেদার অর্থ বরাদ্দ হলেও তা সংখ্যালঘু সমাজের তেমন কোনও উন্নতিতে কাজে লাগবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, রাজ্যজুড়ে কয়েক'শো নতুন মাদ্রাসা-মোক্তব খুলতেই এই টাকা খরচ করা হবে। জানা যাচ্ছে এবছর রাজ্যে আরও ৬৬টি নতুন মাদ্রাসা, ১১০টি নিম্ন মাদ্রাসাকে উচ্চ মাদ্রাসায় পরিণত করা হবে। সেইসঙ্গে ৮৯টি উচ্চ মাদ্রাসাকে উচ্চতর মাদ্রাসায় পরিণত করা হবে।

গত বছরও রাজ্যে সরকার ৫০০ নতুন মাদ্রাসা খুলেছিল। সারা দেশে যখন মুসলিমদের মাদ্রাসা শিক্ষার থেকে সরিয়ে

(এরপর ৪ পাতায়)

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নবনিযুক্ত সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-এর সরসঙ্ঘচালক হলেন মোহনরাও ভাগবত। সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন গত ২০ মার্চ নাগপুরে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক পদে শ্রীভাগবতের নাম ঘোষণা করেন। সঙ্ঘের সংবিধানে এই পদটিকে 'ফ্রেণ্ড , ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীভাগবত হলেন সঙ্ঘের ষষ্ঠ সরসঙ্ঘচালক। ২০০০) এবং কে এস সুদর্শন (২০০০-২০০৯)। এদিন প্রতিনিধি সভা সঙ্ঘের সরকার্যবাহ (জেনারেল সেক্রেটারি) হিসাবে সুরেশ যোশী-কে নির্বাচিত করেন যিনি ভাইয়াজী হিসাবেই সুপরিচিত।

মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলে চন্দ্রপুর শহরে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে শ্রীভাগবতের জন্ম। তাঁর পিতা মধুকররাও ভাগবত গুজরাটে সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। তিন ভাই ও চলছিল। আকোলা-তে তাঁর প্রচারক জীবন শুরু। পরে নাগপুর ও বিদর্ভ প্রান্তের দায়িত্ব পান। ১৯৯১ সালে অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ নিযুক্ত হন। ১৯৯৯-তে অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ। আর ২০০০ সালে তৎকালীন সরকার্যবাহ এইচ ভি শেষাদ্রি ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে অন্য দায়িত্ব নেন এবং শ্রীভাগবত সরকার্যবাহ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৩ ও ২০০৬ সালে সরকার্যবাহ হিসাবে তিনি

(বাঁ দিকে) নবনিযুক্ত সরসঙ্ঘচালক মোহনজী, বৈঠকে আগত প্রতিনিধিদের একাংশ (ডান দিকে)।

তাঁর বয়স ৫৯ বৎসর। এদিক থেকে তিনি দ্বিতীয়, যিনি এই বয়সে সরসঙ্ঘচালক হলেন। সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক রূপে এম এস গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) ৩৪ বছর বয়সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্ঘের ৮৪ বছরের ইতিহাসে সঙ্ঘের আদ্য সরসঙ্ঘচালক ছিলেন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার স্বয়ং। তাঁর মৃত্যুর পর সরসঙ্ঘচালক হন শ্রীগুরুজী (১৯৪০-৭৩)। সঙ্ঘের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক হলেন মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরস' (বালাসাহেব — ১৯৭৩-১৯৯৩), রাজেন্দ্র সিং (রজ্জু ভাইয়া — ১৯৯৪- এক বোনের মধ্যে শ্রী ভাগবত জ্যেষ্ঠ। তাঁর এক ভাই চন্দ্রপুর নগরের সঙ্ঘচালক। নাগপুর থেকে তিনি ভেটেরিন্যারি সায়েন্স এবং অ্যানিমাল হ্যাজব্যানড্রি বিষয়ে স্নাতক হন। পরে কিছুদিন সরকারি পশু চিকিৎসালয়ে চাকরী করেন। আবারও নাগপুরে ফিরে এম এস সি তে ভর্তি হন। ফাইন্যাল ইয়ারেই প্রচারক হিসেবে বের হন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে আত্মোৎসর্গ করেন। সেই সময় সারা দেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থা পুনর্নির্বাচিত হন। প্রায় নয় বছর তিনি সরকার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একসময় তাঁর কেন্দ্র কলকাতায় থাকায় বাংলার স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গত ১৪০৮ বঙ্গাব্দের (২০০১) স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যাটি তিনি উন্মোচন করেছিলেন।

এদিন সন্ধ্যায় রেশমবাগ সঙ্ঘস্থানে নাগপুরের স্বয়ংসেবকদের এক সমাবেশে তাঁকে 'সরসঙ্ঘচালক প্রণাম' জানানো হয়।

বড় দলের ভোটের হার কমছে, ছোটরা লুটছে মজা

নিখিল ভট্টাচার্য ।। ''আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে''। ভোটারের এই স্বপ্ন সাকার না হওয়ার ফলে নির্বাচনের পর নির্বাচনে

গত ছয়টি লোকসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান

সাল	বড় দল		ছোট দল	
	আসন	শতকরা ভোট	আসন	শতকরা ভোট
১৯৮৯	৪৭০	৭৯.৩	২৭	৯.২৮
১৯৯১	৪৬৫	৮০.৯১	৫১	১২.৯৮
১৯৯৬	৪০৩	৬৯.৮	১২৯	২২.৪৩
১৯৯৮	৩০৭	৬৭.৯৮	১০১	১৮.৭৯
১৯৯৯	৩০১	৬৭.১১	১৫৮	২৬.৯
২০০৪	৩৬৮	৬২.৮৬	১৭৪	৩২.৮৬

জাতীয় দলগুলি লোকের আস্থা হারাচ্ছে। নির্বাচনের আগে বড় দলের বড় বড় কথার ঝুড়িভরা ম্যানিফেস্টো, প্রতিশ্রুতি, বিজ্ঞাপন-এর মেলা বসে। সে কাজ আর হয় না এবং ছোট রাজ্যের লোকেদের হতাশা রয়েই যায়। এর ফল গত কয়েকটি লোকসভা নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়। পরপর ছয়টি লোকসভা নির্বাচনে জাতীয় স্তরের দল বিশেষ করে কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি জনসমর্থন ও ভোটারের ভোট আশীর্বাদ হারাচ্ছে। সে জিতে আসা আসনই হোক বা পাওয়া ভোটের শতাংশ হোক। অন্যদিকে নিজস্ব এলাকার রাজ্যস্তরীয় দলের জেতা আসন এবং পাওয়া ভোট বাড়ছে। এবারের নির্বাচনে বড় দল বা জাতীয় দলের সংখ্যা ছয়টি। ছোটি দল বা রাজ্যস্তরীয় দল ২০৮টি। এর মধ্যে অবশ্য নির্বাচন কমিশনের রেজিস্ট্রেশন পাওয়া দলও আছে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত বর্তমানের দুটি আঞ্চলিক দল ওড়িশার বিজু জনতা দল ও মমতার তৃণমূল কংগ্রেস রেজিস্টার্ড দলের মধ্যে। তারা দু'জনই সম্প্রতি বিজেপির রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জোট (এন ডি এ) থেকে বেরিয়ে এসেছে। ২০০৯ সালের নির্বাচনে এই দুই রাজ্যস্তরীয় দলের উপর লোকের নজর আছে।

সব রাজ্যস্তরীয় দলই রাজ্যের স্বার্থে জাতীয় ক্ষমতার আসরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চায়। যেভাবে লালুপ্রসাদ যাদব বিহারকে রেলের টাকায় মুড়ে রেখেছেন, যেভাবে তামিলনাড়ুর কংগ্রেস এবং ডি এম কে'র ১১ জন মন্ত্রী যা পেরেছেন — তামিলনাড়ুতে পৌঁছে দিয়েছেন অন্য এলাকাকে পঙ্গু করে। তাদের কাছে তামিলনাড়ুর প্রাথমিকতা সব থেকে। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন পি চিদাম্বরম জেদ ধরে বসলেন কলকাতার বিমান বন্দরের আধুনিকীকরণে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত চেন্নাইয়ের বিমানবন্দর সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ

(এরপর ৪ পাতায়)

বীরভূমে জনজাতিরা পুড়িয়ে মারল ডাকাতদের

বিশেষ সংবাদাতা, বীরভূম ।। বীরভূম-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে বসবাসকারী জনজাতিদের উপর মুসলমান খাদান মালিক ও পাথর শ্রমিকদের নির্মম অত্যাচারের সম্প্রতি বহিঃপ্রকাশ ঘটল ঝাড়খন্ডের মহেশপুর থানার সুন্দরপাহাড়ি গ্রামে। ১২ জন পাথর শ্রমিক যারা প্রত্যেকেই বহিরাগত এবং মুসলিম, তাদের পুড়িয়ে মারল গ্রামবাসীরা। ওইসব শ্রমিকরা দিনের বেলায় পাথর খাদানে কাজ করত আর রাতে ডাকাতি করত। শারীরিক নির্যাতন চালাত। প্রতিবাদ করলেও পুলিশ খাদান মালিকদের কাছে পয়সা খেয়ে কোনও পদক্ষেপ নিত না। উল্লেখ্য, মুসলিম বহিরাগত শ্রমিকদের এই কাজে ইন্ধন যোগাত খাদান মালিকরাও। মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদ এলাকার বাসিন্দা আশরাফুল শেখ-এর পাথর খাদানে কাজ করত মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদা ও ঝাড়খন্ডের শ্রমিকরা। প্রায় ৯০ শতাংশ জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম সুন্দরপাহাড়ি। অভিযোগ — সন্ধ্যা নামতেই এই পাথর শ্রমিকরা স্থানীয় জনজাতিদের গ্রামে অত্যাচার চালাত। এই ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলায় এলাকার জনজাতিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকত। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী অনিল গুপ্তার বাড়িতে ডাকাতি করতে যায় শ্রমিকরা। প্রথমে বোমাবাজি ও পরে গুলি চালায়। অনিল গুপ্তার স্ত্রীর গায়ের গহনা ছিনিয়ে নেয়। অনিল-এর ভাই এর মাথায় ভোজালির কোপ মারে। চিৎকার চেঁচামেচিতে জনজাতিরা জেগে যায়। নিজেদের ভাষায় তারা চিৎকার করে লোক ডাকতে শুরু করে। ধামসা বাজানোয় শ'য়ে শয়ে জনজাতি মানুষ ডাকাতি করতে আসা শ্রমিকদের তাড়া করে। তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে দু'জন পাথর শ্রমিক ধরা পড়ে যায়। মারধোর করতেই তারা বলে দেয় যে আশরাফুল শেখের পাথর খাদানের শ্রমিক তারা। বাকিরা খাদানের ঘরে লুকিয়ে আছে। উন্মত্ত গ্রামবাসীরা ধৃত ২ জন ডাকাতকে ওখানেই পিটিয়ে মারে। বাকিদের তাড়া করে খাদানের ম্যানেজার-এর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলে। পাথর শ্রমিকরা বেরিয়ে না আসায় আগুন লাগিয়ে দেয় গ্রামবাসীরা। পুড়ে মারা যায় ৮ জন শ্রমিক। আর ২ জনকে ধরতে পেরে পিটিয়ে মারে গ্রামবাসীরা। ঝাড়খন্ডের মহেশপুর থানার পুলিশ মোট ১২টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তবে পাকুড় জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ নেহাল স্বীকার করেছেন, পাথর শ্রমিকরা ডাকাতি করতে গিয়েছিল এবং এলাকার মহিলাদের তারা শ্লীলতাহানি করে। জনরোষেই ডাকাতরা মারা গিয়েছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গরীব জনজাতিদের ঠকিয়ে জোর করে বহিরাগত মুসলমান খাদান মালিকরা তাদের কাছ থেকে জমি নিয়েছে। এমনকী জনজাতিদেরও জায়গা দখল করে নিয়েছে ক্ষমতার জোরে । তার উপর খাদান-এ প্রতিদিন কাজ করার জন্য স্থানীয় জনজাতিদের না নিয়ে বহিরাগত শ্রমিক এনে কাজ করায় । ফলে এলাকার মানুষের দু'বেলা খাবার জোটে না। তার উপর লুটতরাজ, মহিলাদের শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা হামেশাই ঘটত এলাকায়। এর ফলেই রাগে ফুঁসছিল এলাকার জনজাতি মানুষরা। এই ঘটনা তারই জের।

এই সময়

যোগের স্বরূপ

যোগ নিয়ে এদেশের উলেমাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা থাকলেও, ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয় উলেমাদের মধ্যে যোগ নিয়ে কোনও অ্যালার্জি নেই। ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষিত ভারতীয় মুসলিমরা যোগকে ইসলাম বিরোধী হিসাবে মানতে রাজি নন। সম্প্রতি রাজধানী জাকার্তায় সেন্টার অফ মাল্টি ফেথ-এর নির্দেশক সলমান হারুণ পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, এখানকার ভারতীয় মুসলিম বিদ্যার্থীরা যোগকে ইসলাম বিরোধী বলে মনে করেন না। যোগের মধ্যে শারীরিক গুণের দিকটাই বড় বলে তারা মনে করেন। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষিত মুসলিম বিদ্যার্থীদের এই ভ্রান্ত ধারণা এখনও রয়েছে। সেদিক থেকে ইন্দোনেশিয়া অনেকটা ভ্রান্ত ধারণার বাইরে।

মহিলা ভোটার

এবারের লোকসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটাররা বড় রকম ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। দেশের ৬টি রাজ্যে পুরুষ ভোটারের থেকে মহিলা ভোটার বেশি রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম ও পুডুচ্চেরিতে মহিলা ভোটার এখন সব থেকে বেশি। পুরুষদের ভোটের থেকে তাদের ভোটই এই রাজ্যগুলিতে প্রার্থী নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে। মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ যে পার্টিকে সমর্থন করবে, সেই পার্টির সাংসদের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা জলের মতোই পরিস্কার। দেশের মোট মহিলা ভোটার হল ৩৪ কোটি ৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৪০৬ জন।

নেপথ্যে দায়ী

এদেশে স্কুল-কলেজে র‍্যাগিংয়ের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণ হারানো বা পড়াশোনা লাটে ওঠার চিত্র নতুন নয়। র‍্যাগিং না কমার পিছনে এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি হিমাচলপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের দুইটি পৃথক র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় উচ্চ আদালত এমনই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হিমাচলপ্রদেশে র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র প্রাণ হারায়। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশে বাপাতলা কৃষি ও কারিগরী কলেজের এক ছাত্রীকে র‍্যাগিংয়ের সময় নগ্ন করার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট র‍্যাগিংয়ের জন্য পরোক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বলতার দিকটিই তুলে ধরেছেন। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল ও রেজিস্ট্রারকে শো-কজ নোটিশও দিয়েছেন কোর্ট।

ব্যর্থতা চরমে

ইউ পি এ সরকারের চরম ব্যর্থতার চিত্র এবার বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্টেও উঠে এল। বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট রিপোর্টে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কঠোর সমালোচনা করেছে। এর মধ্যে বেশি সমালোচিত হয়েছে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প বা রেগা। এই প্রকল্পের দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার নিজেই বাধা তৈরি করেছে বলে ইউপিএ সরকারের নিন্দা করছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক।

দুর্বলতার পরিণাম

আই পি এল ভারতের মাটি থেকে বিদেশে চলে যাওয়ার পিছনে কেন্দ্র সরকারকেই দায়ী করলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা অরুণ জেটলি। গত ২২ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কেন্দ্র সরকারকে এক হাত নেন। তিনি বলেন, ইউ পি এ সরকার নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারণেই আই পি এল বিদেশের মাটিতে হতে চলেছে। ইউ পি এ সরকারের এই ব্যর্থতার কারণে আগামী দিনে ক্রিকেটার ও পর্যটকদের কাছে ভারতে আসার আগে নিরাপত্তার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাঁড়াবে বলে তিনি মনে করেন। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের এই ব্যর্থতার দাম দিতে হল সমগ্র ভারতবাসীকে।

জনদরদে বাধা

ভোটের মুখে তড়িঘড়ি সরকারি প্রকল্পগুলির অতিরিক্ত কাজ করিয়ে জনগণকে খুশী করতে পারবে না কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্র সরকারকে এজন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিতে হবে বলে কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ স্কিম যেমন, ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট অর্থাৎ রেগার মতো প্রকল্পগুলির অতিরিক্ত কাজ করাতে গেলেও কেন্দ্র সরকারকে এজন্য নির্বাচন কমিশনারের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে ভোটের আগে আদাজল খেয়ে জনদরদী হবার চিত্রে কিছুটা হলেও বাধ সাধল নির্বাচন কমিশন।

বিজ্ঞাপনের শিকার

বাচ্চাদের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রতি ঝোঁক বাড়ার অন্যতম কারণ হল বিভিন্ন চটকদার প্রলোভনকারী বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের চমকই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চাদের সেই খাদ্যের উপর ঝোঁক তৈরি করাচ্ছে। 'জাঙ্ক ফুড ট্রাপ' নামে এক সংস্থা একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে বাজারি বিজ্ঞাপনের কুপ্রভাবেই বাচ্চারা না জেনে, না বুঝে সেই খাবার খাওয়ার জন্য বাবা-মা'র কাছে ঝোঁক ধরে। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের উপর সে রকম কোনও বিধি-নিষেধ না থাকার ফলে এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে বলে অনেকে মনে করছেন।

হিন্দুত্বের পক্ষে

হিন্দুত্বের পক্ষেই রাজনীতির চালিকাশক্তি পরিচালিত হবার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া। সম্প্রতি ধর্মরক্ষা অর্পণ নিধি নামে এক কার্যক্রমে তিনি এমনই আভাস দেন। হিন্দুত্বের পক্ষে মসনদে বসে যারা দেশের সেবা করবে, তাদেরকেই হিন্দুদের হিতচিন্তক রূপে মসনদে বসানো উচিত বলে শ্রীতোগাড়িয়া তাঁর বক্তব্যে জানান। তিনি এজন্য বিশেষ কোনও দলকে চিহ্নিত করেননি। দেশের সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুতর সমস্যার মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা নেবে, এমন দলেরই মসনদে বসা উচিত বলেও তিনি মনে করেন। হিন্দু সমাজ সব দলের প্রতিই উন্নয়ণের দাবি রাখে বলেও তিনি জানান

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাম ও কংগ্রেস সঙ্কটে

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করিবার পরই রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলি আসন ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের সর্বভারতীয় দুই প্রধান দল কংগ্রেস ও বিজেপি তো বটেই, আঞ্চ লিক দলগুলিও যতটা সম্ভব নিজেদের কোলে ঝোল টানিতে কসুর করিতেছে না। এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বিপাকে পড়িয়াছে বাম দলগুলি। চতুর্দশ লোকসভায় এই বাম দলগুলির মোট আসন ৬১ টি। সবাই মনে করিতেছেন — এমনকী বামদলের অনেক নেতাও মনে করিতেছেন যে, পঞ্চ দশ লোকসভায় বামদলগুলির আসন সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। ৫৪৩ সদস্য বিশিষ্ট লোকসভায় ৬১ টি আসন মোটেই গর্ব করিয়া বলিবার মতো নহে। কিন্তু বামদলগুলি যে সেই কথা গর্বের সহিত বলিতেছে তাহার কারণ হইল, দুই প্রধান — কংগ্রেস ও বিজেপি ব্যতীত বাকি দলগুলির মধ্যে বামফ্রন্টই সবচেয়ে বেশি আসনের অধিকারী। সিপিএম কিংবা বামদলগুলির পক্ষে এই চিত্রটা মোটেই গৌরবজনক নয়। তাহাদের অনেক পরে স্থাপিত হইয়াছে লোকসভায় এমন দলের সাংসদ সংখ্যা অনেক বেশি। এই দুরবস্থার কারণ হইল, বামদলগুলি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসারী নয়। বাইরের রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনুগামী হইয়া তাহারা স্বদেশের অধিবাসীদের হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। অথচ তাহাদের দলের কোনও নেতাই বিষয়টির দিকে দলীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। যে দলের শিকড় ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে নাই, সেই দলটি ভারতে কিছুতেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিবে না। মাত্র তিনটি রাজ্যে ব্যতীত বামদলগুলির প্রভাব খুঁজিয়া পাইতে হইলে চোখে দূরবীন লাগাইতে হইবে।

তবুও বামদলগুলির নেতা সিপিআই (এম)-এর কংগ্রেসের দয়াতেই হউক, কিংবা নির্বাচন কমিশনের নয়া নীতির দাক্ষিণ্যেই হউক, সর্বভারতীয় দলের তক্‌মা এখনও রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনের পর সম্ভবত নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সিপিএম-কে সর্বভারতীয় দল হিসাবে স্বীকার করা সম্ভব হইবে না। কেননা আগামী দিনে সর্বভারতীয় দল হইবার ন্যূনতম যোগ্যতা হয়তো সিপিএমের থাকিবে না। সেই দুশ্চিন্তার ভাঁজই সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের রক্তে রাঙানো হাতের অধিকারী তথা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর কপালে বারবার উঠিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে দলীয় সংগঠন খুবই বেকায়দায় রহিয়াছে। দল যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য বুদ্ধদেববাবুকে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না, সেখানে ধরিয়া লইতে হয়, বুদ্ধবাবুর উজ্জ্বল কোনও ভাবমূর্তি তো নেইই, বরং জনসভায় তিনি বক্তৃতা দিলে দলের ভোট অনেক কমিয়া যাইতে পারে। দলের আরও সর্বনাশ করিয়াছেন কারাত স্বয়ং। নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট মডেলের প্রশংসাকারী কেরলের সাংসদ আবদুল্লা কুট্টি সহ আরও কিছু নেতাকে দল হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া স্রেফ গুঁয়ার্তুমি করিয়া শ্রীকারাত নিজের ভুল সিদ্ধান্তকে দলের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন।

সিপিএম আবার তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করিয়া ঘোলা জলে মাছ ধরিবার খোয়াব দেখিতেছে। ৫৪৩ সদস্যের লোকসভায় 'ম্যাজিক ফিগার' হইল ২৭৩। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথা সব মহলেই স্বীকৃত যে, এককভাবে কোনও দলই লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে না। রাজনৈতিক পন্ডিতগণের বক্তব্য, কংগ্রেস বা বিজেপি-কে বাদ দিয়া কোনও শক্তি উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। ভারতের জাতীয় রাজনীতি দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের দিকে না চলিলেও মোটামুটিভাবে দুইটি জোটের গণতন্ত্রের দিকে চলিতেছে। এই দুই বড় জোটের একটি হইল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ মোর্চা এবং দ্বিতীয়টি হইল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ মোর্চা।

ভোটের আগে বিভিন্ন শরিক দলগুলিকে লইয়া বিজেপি সংকটে পড়িলেও ক্রমশই তাহা কাটাইয়া উঠিতেছে। অবশ্য 'এ পার্টিস উইথ এ ডিফারেন্স' বলিয়া যাহারা দাবি করিয়া থাকে, তাহাদের 'চাল-চেহারা-চরিত্রে' ইহার প্রকাশ না ঘটিলে সঙ্কটের আশঙ্কা থাকিয়াই যাইবে। অন্যদিকে শাসক কংগ্রেস দলও সঙ্কটের মুখোমুখি। ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টির সহিত কংগ্রেসের নির্বাচনী আসন সমঝোতা হয় নাই। বিহারেও দুই শরিক দল আর জে ডি এবং লোকজনশক্তি পার্টির সঙ্গেও কোনও আসন সমঝোতা হয় নাই। বিহারে মাত্র তাহারা তিনটি আসন কংগ্রেসকে ছাড়িয়া দিয়াছে। আবার ঝাড়খন্ড রাজ্যে কংগ্রেস ও জে এম এম আসন সমঝোতা করিলেও আর জে ডিকে পথে বসাইয়াছে। কংগ্রেসের দখলে বড় রাজ্য বলিতে শুধু অন্ধ্রপ্রদেশ ও অসম। অন্য রাজ্যগুলিতে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে রহিয়াছে। কোনও আঞ্চ লিক বা ছোট দল কংগ্রেসকে আর বিশ্বাস করে না। জোট রাজনীতির শর্ত যে কংগ্রেস মানিয়া চলিতে চায় না তাহারা তাহা জানে। এই কারণেই একদা যাহারা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোটের শরিক ছিল, তাহারাই এখন অন্তর্ঘাত করিতে ব্যস্ত। কংগ্রেস এখন যত কম আসন পায়, এমনকী ১৯৯৯-এ কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন ১১৪-এরও নীচেও — ইহাই তাহাদের কাম্য। আর ইহা যদি ঘটে তবে নির্বাচনোত্তর সময়ে কংগ্রেসকে আরও বড় সঙ্কটের মুখোমুখি হইতে হইবে।

দুর্নীতিগ্রস্ত সি পি এমের নীতি এখন চিলেকোঠার সেপাই

মানিক দেব

চরম আদর্শচ্যুতি এবং নীতিভ্রষ্টতার ফলে সিপিআইএম দলে মতানৈক্য বাড়ছে। নেতারা প্রকাশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার ও গালিগালাজ করছেন। পত্র-পত্রিকায় দলের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি আকছার প্রকাশিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায়, তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। তিন রাজ্যে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থেকেও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে লাল পতাকা ম্রিয়মাণ। টিকে আছে শুধুমাত্র বিরোধী দলের ব্যর্থতায়। মাত্র ষাট বছর কাটতে না কাটতেই বাঁচার তাগিদে দিগ্‌ভ্রান্ত সিপিআইএম দল বিজেপি শিবসেনা এবং নরেন্দ্র মোদি বান্ধব মায়াবতীর সঙ্গে হাত মোলাতে সচেষ্ট। কাণ্ড কারখানা দেখে সাচ্চা বামপন্থীরা হতবাক। দূরত্ব বাড়ছে দলের সঙ্গে তাদের। প্রকাশ কারাতদের পাশাপাশি এক বিধায়ক কন্যার মুসলিম যুবকের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক নিয়েও দল সমালোচনায় জেরবার। আসলে নীতিহীনতার ফলে দলে এমনভাবে বেনোজল ঢুকেছে যে সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।

শৃঙ্খলাহীনতায় সিপিএম দল বিপর্যস্ত। কেরলের কোট্টায়ামে গত বছর রাজ্য সম্মেলনে ক্যাডাররা মদ খেয়ে মাতলামি শুরু করে দেয়। রাজ্য সম্পাদক বিজয়ন বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন মঞ্চে উপস্থিত হলে ক্যাডারদের উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অচ্যুতানন্দন সংবাদ মাধ্যমের কাছে এই সম্মেলনকে 'উষা উত্থুপ মিউজিক্যাল কনফারেন্স' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। এই বছর ১০ জানুয়ারি কোচিতে তিন দিনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা শেষ হয়েছে। ওই সভায় পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এ বছর আগে থেকেই দল সাবধানতা অবলম্বন করে দলীয় নির্দেশ জারী করে। ওই নির্দেশে বলা ছিল যে, প্রকাশ কারাতের বক্তৃতায় হাততালি দিতে হবে এবং কোনও অবস্থায় সভাস্থলে মদ খাওয়া চলবে না। দলীয় শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। গত বিধানসভা নির্বাচনে কেরলের সিপিএম দল অচ্যুতানন্দনকে টিকিট দিতে চায়নি। পরবর্তী সময়ে অচ্যুতানন্দন সমর্থকদের জঙ্গি মশাল মিছিলের দাপটে দল তাকে টিকিট দিতে বাধ্য হয়। জয়ী হয়ে অচ্যুতানন্দন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু বর্তমান অবস্থা দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সি পি এম দলের পক্ষে বিগত লোকসভা ভোটের ফলাফল এ বছর ধরে রাখা অসম্ভব।

> **"দিশাহীন সিপিএম পথভ্রষ্ট অবস্থায় এখন মহাসংকটে। এক সময় টাটা-বিড়লাকে পুঁজিপতি এবং বুর্জোয়া বলে গালাগাল দিত, এখন তাদেরকে কোলে বসিয়ে দোল দেয়। তাদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত সিপিএম। পশ্চিমবাংলায় এখন ষাট থেকে সত্তর শতাংশ বৃহৎ শিল্পপতিদের পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। এক সময় যারা অচ্ছুৎ ছিল, তারা বর্তমানে সবচেয়ে বেশী স্বাগত। নন্দীগ্রাম সিপিএমের কপালে কলঙ্ক তিলক।"**

দিশাহীন সিপিএম পথভ্রষ্ট অবস্থায় এখন মহাসংকটে। এক সময় টাটা-বিড়লাকে পুঁজিপতি এবং বুর্জোয়া বলে গালাগাল দিত, এখন তাদেরকে কোলে বসিয়ে দোল দেয়। তাদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত সিপিএম। পশ্চিমবাংলায় এখন ষাট থেকে সত্তর শতাংশ বৃহৎ শিল্পপতিদের পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। এক সময় যারা অচ্ছুৎ ছিল, তারা বর্তমানে সবচেয়ে বেশী স্বাগত। নন্দীগ্রাম সিপিএমের কপালে কলঙ্কতিলক। শরিক দলের মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য তার জন্য সিপিএমকে দায়ী করেছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের পুঁজিবাদী নীতির বিরুদ্ধে একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আটত্রিশ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ার জন্য তারা সিপিএম-কে দোষারোপ করছে এবং সি পি এমের ভ্রান্ত নীতির ফলে জমি আবার জোতদারদের হাতে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রকাশ্য সভায় তথ্য সহযোগে বলা হয়েছে যে, বৃহৎ শিল্পপতিরা প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে শিল্পক্ষেত্রে — যার ফলে পশ্চিমবাংলা এদের দখলে চলে যাচ্ছে। এদের সুবিধা দিতে গিয়ে শ্রমিক স্বার্থও বিপন্ন। গরীব কৃষকদের জমিছাড়া করতে কিংবা পুলিশ ও হার্মাদ বাহিনী পাঠিয়ে গুলি করে মারতেও হাত কাঁপে না সিপিএমের। যে কাজের জন্য এক সময় সিপিএম অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে সরব ছিল এখন তারা নিজেরাই সেই অভিযোগে অভিযুক্ত।

দ্বিচারিতায় সিপিএম ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। গত বছর জানুয়ারি মাসে বুদ্ধ বাবুকে গণশক্তির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বলতে শোনা গেছে যে, শিল্পায়নের স্বার্থে পুঁজিবাদ ভিন্ন বিকল্প নেই, বুদ্ধ দেবকে সমর্থন জানিয়ে জ্যোতিবাবু জানান যে, বর্তমান অবস্থায় ধনতন্ত্রই একমাত্র পথ। প্রকাশ কারাত আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে, তিন রাজ্যে ক্ষমতায় থেকে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে বাস্তব সত্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে। ঘটনা এখানেই থেমে থাকলে কারও কিছু বলার ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন তীব্র ভাষায় এদের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন। এর্নাকুলাম জেলায় দলীয় সমাবেশে প্রকাশ কারাতদের বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেন যে, বামপন্থীদের কাছে সমাজবাদই একমাত্র পথ। তা থেকে বিচ্যুত হবার উপায় নেই। যারা পুঁজিবাদের সমর্থন করছেন তারা অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়বেন। সিপিএম শাসিত দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দু'রকম নীতির অনুসারি। সাধারণ কর্মীদের অবস্থা সঙ্গীন। এক সময় সিপিএম তথ্য প্রযুক্তি এবং কম্পিউটারের বিরোধিতা করেছে। এখন নেতৃবৃন্দের ল্যাপটপ ছাড়া চলে না, বুদ্ধবাবু আই টি হাব করার জন্য পাগল। গ্যাট চুক্তির বিরোধিতা করে ভারত বন্‌ধ করেছে অথচ এই চুক্তির ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বারোগুণ বেড়েছে। এশিয়ায় জাপানের পরই ভারতের অবস্থান। অ্যাসোচেম-এর বার্ষিক সভায় বুদ্ধবাবু বন্‌ধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেন যে, ভবিষ্যতে বন্‌ধ ডাকা হলে তিনি চুপ করে থাকবেন না। তারা নিজের দলের বন্‌ধ ডাকাকে তিনি দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেন। সিপিএম

(এরপর ১৩ পাতায়)

সঙ্ঘের নবনির্বাচিত সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা এবছর সুরেশ যোশীকে সরকার্যবাহ পদে নির্বাচিত করেছে।। তিনি ভাইয়াজী বলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে বেশি পরিচিত, আন্তরিকভাবে ঘনিষ্ঠ। ভাইয়াজী ১৯৪৭ সালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত থানে কলেজ থেকে কলাবিভাগে স্নাতক হন। ১৯৭৫ সালে সঙ্ঘের কাজে প্রচারক হিসেবে আত্মনিয়োগ করার আগে কিছুদিন এক প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করেছেন। ওই বছর জরুরি অবস্থা জারি হলে ভূমিগত থেকেও সংগঠনের কাজ চালিয়ে যান। জেলা প্রচারক থেকে বিভাগ প্রচারক হিসাবে মহারাষ্ট্রের থানে, ধুলিয়া, জলগাঁও ও নাসিক জেলাতে ১৯৯০ পর্যন্ত সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র প্রান্ত সেবাপ্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সময়ে ১৯৯৩ সালে লাতুর জেলাতে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। তখন তিনি সেখানে ত্রাণ ও পুনর্বাসন-এর কাজও পরিচালনা করেন। ১৯৯৫ থেকে '৯৭ পর্যন্ত ভাইয়াজী পশ্চিম ক্ষেত্রের সেবা প্রমুখের দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেন। ১৯৯৭-এ অখিল ভারতীয় সহ-সেবা প্রমুখের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর থেকে এবছর পর্যন্ত তিনি সহ-সরকার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেন। এখন তিনি নির্বাচিত সরকার্যবাহ (সাধারণ সম্পাদক)। ভাইয়াজী সঙ্ঘের কাজে দেশজুড়ে নিরন্তর ভ্রমণ করছেন। শাখার কাজে অথবা সেবা কাজ — তাঁর অভিজ্ঞতা তথা উপলব্ধি ব্যাপক। প্রায় কুড়ি বছর দেশ জুড়ে সেবা কাজে তিনি মার্গদর্শন করে চলেছেন।

সঙ্ঘের নতুন সরসঙ্ঘচালকের ঘোষণা— এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত

তরুণ কুমার পণ্ডিত ।। এবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে এক ঐতিহাসিক এবং রোমাঞ্চ কর মুহূর্তের সাক্ষি ছিলাম। এবছর সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে ১২০০-এর বেশি সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধিরা নাগপুরে পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর স্মৃতি বিজড়িত রেশমবাগে সমবেত হয়েছিল।

গত ২১ মার্চ প্রতিনিধি সভার বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে সরকার্যবাহ নির্বাচনের জন্য সরকার্যবাহ মোহন ভাগবত সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর পাশে বসে থেকে আচমকা উঠে গিয়ে সহ সরকার্যবাহ মদনদাসজীকে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালানোর জন্য আমন্ত্রণ জানালেন এবং মদনদাসজী সুদর্শনজীর পাশে এসে বসলেন। তার আগে বেশ কয়েকবার মণ্ডপ থেকে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল এবং মোহনজী তাঁর বক্তব্যে বললেন, দীর্ঘ ৯ বছর ধরে আমি সরকার্যবাহ রয়েছি, এবার আপনারা নতুন কাউকে নির্বাচিত করুন। বার বার বিদ্যুৎ চলে যাওয়াতে মনে হয় সেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তখনও প্রতিনিধি সভায় সারা ভারতবর্ষ থেকে আগত প্রতিনিধি ও অখিল ভারতীয় কার্যকর্তারা ভাবতে পারেননি সঙ্ঘে আর এক বিরাট পরিবর্তন অপেক্ষা করছে। সুদর্শনজী সরকার্যবাহ নির্বাচন পরিচালনাকারী মদনদাসজীর কাছ থেকে হঠাৎ মাইক নিয়ে বলতে শুরু করলেন, পরমপূজনীয় ডাক্তারজী গুরুজী বালাসাহেব দেওরসের পর রজ্জুভাইয়া যে দায়িত্ব আমার কাঁধে দিয়েছিলেন গত ৯ বছর ধরে তা আমি পালন করলাম। কিন্তু এখন আমার শরীর ঠিক মতো চলছে না। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, সঙ্ঘের মূল যে প্রক্রিয়া ভ্রমণ — সেটিও করতে আমার অসুবিধা হচ্ছে। আর সব চেয়ে বড় অসুবিধা আমি এখন আর নাম মনে রাখতে পারি না। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নাম মনে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণ শ্রীগুরুজী শিখিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত সুদর্শনজী বললেন, মহালের সঙ্ঘ কার্যালয়ে দীর্ঘদিনের এক পাচক ছিলেন এবং মারা যাওয়ার পর তার ছবি সেখানে টাঙানো ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে আমি সেই পরিচিত পাচকের নামটিও মনে করতে পারছিলাম না। কার্যালয়ের কাউকে বলতেও লজ্জা হচ্ছিল, যে এত পরিচিত লোক তার নাম ভুলে যাচ্ছি! সাত দিন পরেও তার নাম মনে না করতে পেরে শেষে একজনকে আমি সেই পাচকের নাম জিজ্ঞেস করলাম এবং তখন আমার মনে পড়ল। এই রকম অবস্থায় সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানীয় পদ আঁকড়ে ধরে রেখে আমি ডাক্তারজীর এই মহান ঐতিহ্যশালী সংগঠনের অপমান করতে চাই না। তাই যোগ্য, কর্মঠ, সদাহাস্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সংগঠন কুশলী ব্যক্তি মোহনজী ভাগবতকে আমি পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক হিসাবে নিযুক্ত করছি। সেই মুহূর্তে সমগ্র সভাগৃহটি পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতায় ডুবে গিয়েছিল এবং

প্রতিনিধি সভার (২০০৯) একটি স্মরণীয় মুহূর্ত— সরসঙ্ঘচালক মোহনজী প্রতিনিধিদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

স্বয়ংসেবকদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। সুদর্শনজী সঙ্ঘের সর্বোচ্চ পদে সরসঙ্ঘচালক হিসাবে মোহনজীকে নিজের চেয়ার থেকে উঠে তাঁকে বসালেন — এক সেকেন্ডের জন্য সভাগৃহের পরিবেশ বদলে গেল। মোহনজীকে সুদর্শনজী শাল ও ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানালেন। মোহনজী ততক্ষণে তাঁর চেয়ে বড় অধিকারীদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ওদিকে ততক্ষণে বিউগ্‌ল বেজে উঠেছে, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার লোকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের দুই মিনিট আগে বিজেপি অধ্যক্ষ রাজনাথ সিং চেয়ারে এসে বসেছেন, তাঁরও চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। একমাত্র সঙ্ঘের মধ্যেই হিন্দু পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে মনে রেখে বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদ দু' মিনিটের মধ্যে অন্য আর একজনের উপরে চলে যেতে পারে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই। এটা একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যেই সম্ভব। আমরা সকলেই এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষি রইলাম। সেইদিন বিকেলে মাত্র দু' ঘন্টার সূচনাতে নাগপুর মহানগরের দুই হাজারের উপর স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১২ শো প্রতিনিধি ছাড়াও অখিল ভারতীয় স্তরের সব কার্যকর্তা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৫০-৬০টি সংস্থা উপস্থিত ছিল। এই সভার আগে সরসঙ্ঘচালক প্রণাম দেওয়া হয়। ঘোষ বাদকর ছন্দস্তব্ধ বাজনার মাধ্যমে নতুন সরসঙ্ঘচালককে অভিবাদন জানান। অনুষ্ঠানে তিনজন সরসঙ্ঘচালককে দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ডঃ বজরংলাল গুপ্তা, ৪ জন সরসঙ্ঘচালককে দেখা প্রবীণ প্রচারক রঙ্গাহরিজী তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। শেষে পর্বে ডাক্তারজীকে দেখেছেন এমন কার্যকর্তা বাবুরাও বৈদ্যর বক্তব্য সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। সুদর্শনজী বলেন, সঙ্ঘের মধ্যে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। এখন আমি ভূঃ পূ (ভূতপূর্ব) সরসঙ্ঘচালক এবং মোহনজী পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক। এখন থেকে সরসঙ্ঘচালকজী যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেইভাবে কাজ করব। নাগপুরের নাগরিক ও স্বয়ংসেবকদের সামনে সুদর্শনজী মোহনজীকে শাল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। নতুন সরসঙ্ঘচালক মোহনজী বলেন, এই পদ হচ্ছে শ্রীগুরুজীর ভাষায় বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন, আপনাদের মতো দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা সঙ্গে থাকলে আমি এই দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে কাজ করব। সরসঙ্ঘচালকের কথা সমাজ তখনই স্বীকার করবে যখন সংগঠন শক্তিশালী হবে আর শাখা শক্তিশালী হলে সংগঠন মজবুত হবে। আপনাদের সক্রিয়তার উপরই সরসঙ্ঘচালকের মর্যাদা নির্ভর করছে।'

ছোটরা লুটছে মজা

(১ পাতার পর)

সিদ্ধান্ত না নেন। যেদিন চেন্নাই প্রকল্প নিয়ে সিদ্ধান্ত হল সেইদিনই কলকাতার কথাও ঘোষণা হল। পিছনে হয়তো চাপ ছিল সমর্থক দল ডি এম কে-র। অসহায় পশ্চিমবঙ্গ। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের চরিত্র খারাপ হবে রাজ্যের জন্য কিছু করলে। আবার ভয় কিছু করলেও বামেদের রাজ্যে সুযোগ বাড়বে। বামেদের বিশেষ করে জাতীয় দল সি পি আই এম-এর কিছু করার সুযোগ নেই। সি পি আই (এম) মন্ত্রিসভায় সমর্থন দিতে পারে, নিজেরা মন্ত্রী হতে পারে না। জাতীয় স্তরেই নীতির কথা বলে হল্লা-গোল্লা করতে পারে। রাজ্যের স্বার্থ হাসিল করতেই রাজ্যস্তরীয় দলগুলো জাতীয়স্তরে এগিয়ে আসছে। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর পুস্তিকায় প্রকাশ পেয়েছে আঞ্চলিক দল কী করে উঠে আসছে। (সরণী দ্রষ্টব্য -১ পৃঃ)

কংগ্রেস ও বিজেপির ভোটের হার কমেছে। ১৯৯৯ সালে কংগ্রেসের বাক্সে পড়েছিলো ২৮.৩৩ শতকরা ভোট। ২০০৪ সালে সেটা দাঁড়ায় ২৬.৫৩ শতকরা। বিজেপি'র ভোটের হার ১৯৯৯ সালের শতকরা ২৩.৭৫ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলো শতকরা ২২.২২ শতাংশে।

এই দুই বড় দলেরই ভোটপ্রাপ্তির অধোগমন দৃষ্টিতে রেখেই তোড়জোড় চলছে ওদের বাদ দিয়ে সরকার গড়ার সুযোগ পাওয়া যায় কি না? ফিলহাল তো আঞ্চলিক দলগুলোর রমরমা। যে যার এলাকায় সব নিয়ে যাবেন, অন্য এলাকার লবডংকা।

(দৈনিক সংবাদ-এর সৌজন্যে)

মুসলিম তোষণ

(১ পাতার পর)

নিয়ে এসে মূল ধারার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার উল্টো পথে হাঁটছে। প্রশ্ন উঠছে, সংস্কৃত পণ্ডিতরা এবার রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে থাকা টোলগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানালে সরকার কি করবে? হিন্দুরা নিজ উদ্যোগে সংস্কৃত শিক্ষা নেয়। তা বলে অঙ্ক-বিজ্ঞান, ইংরেজি পড়া থেকেও বিরত থাকে না। আর মুসলিমদের তুষ্ট করতে সরকার করদাতাদের টাকার ধর্মশিক্ষা দেওয়ার কাজ করছে। এবং এই শিক্ষা কেমন? মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কয়েক বছর আগেই মালদহে এক জনসভায় বলেছিলেন, এরাজ্যের মাদ্রাসাগুলো জঙ্গিদের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। এই জঙ্গি তৈরির জন্যই কি সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে?

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্যও দলীয় মুখপত্রে ব্ল্যাক আউট

নিশাকর সোম

এখন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতির আবর্তন। তথাপি প্রথমেই নির্বাচনী সংবাদ বাদে একটি প্রসঙ্গ তুলছি। সম্প্রতি সিপিএম-এর একটি পার্টি অফিস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে প্রমোদ দাশগুপ্ত সাধাসিধে ভাবে থাকতেন এবং তাঁর মতোন হওয়া উচিত। মজার কথা, বিমান বাবুর এই বক্তব্য সিপিএম-এর দৈনিক ব্ল্যাক আউট করে দিয়েছে।

যা হোক, নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই সিপিএম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্কলহ বাড়ছে। পূর্বেই এই কলামে লেখা হয়েছিল যে বিতর্কিত মন্ত্রী নেতা সুভাষ চক্রবর্তীকে লক্ষ্মণ শেঠ-এর কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে — সঙ্গে অবশ্যই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্রও আছেন। সুভাষবাবুর উপস্থিতিটা হলদিয়ার কিছু কর্মীর মনে বিরক্তির উদ্রেক করেছে।

সিপিএম-এর অভ্যন্তরের একটা ঘটনা খুবই তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠেছে। তা'হল সিপিএম-এর কর্মীরা নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে যেতে চাইছেন না। কারণ হল তাঁরা রাজনৈতিক কথা বলতে পারেন না। অতীতে সিপিএম-এর একাধিক নেতা -সাংসদকে বলতে শোনা যেতো, নির্বাচন তো 'ওয়ান ডে ম্যাচ'। তার মানে হল — অস্ত্রশস্ত্র-এ সজ্জিত হয়ে ভোট করিয়ে জিতে ফেলো। ফলে নিচের তলার কর্মীদের দীর্ঘদিন ধরে 'টেস্ট খেলার মানসিকতার' অভাব দেখা যাচ্ছে। প্রায়শই বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে বোঝানোর পরিবর্তে হুমকি দিয়ে পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যার ফল ভোটের বাক্সে দেখা যাবে।

এর উপর বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের "ঘরশত্রু বিভীষণ"দের বিতাড়ন

এবং ধমকানি-শাসানির ফলে পার্টি সংগঠনের গতি শ্লথ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলায়, কয়েকটি অঞ্চলে বহু পার্টি সদস্যকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এখন তাঁরা তৃণমূল-কংগ্রেস জোটে বাসা বাঁধছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, কৃষ্ণনগরে সিপিএম সাংসদ জ্যোতির্ময়ী সিকদার-এর বিরুদ্ধে সিপিএম-এর সদস্যদের এক অংশ ভোট করবেন। তাঁরা আবার তৃণমূলী প্রার্থীকে ভোট দেবেন না। ফলে তাঁদের ভোট সত্যব্রত মুখার্জি (জুলুবাবু)-এর পক্ষে পড়াটাই স্বাভাবিক।

সিপিএম শিল্পায়নের স্লোগান দিচ্ছেনা। কেবলমাত্র নৈরাজ্য বিরোধী এবং বাংলাভাগ করার বিরোধী নেতিবাচক স্লোগান দিচ্ছে। প্রসঙ্গত সিপিএম-এর নীতির ফলেই আজ রাজ্যে নৈরাজ্যবাদ এবং অনুন্নত অঞ্চল আলাদা রাজ্যের দাবি জানাচ্ছে। তিন দশকেও রাজ্যের উত্তরবঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নয়ন হয়নি।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি নেতৃত্বের অবস্থা কিল খেয়ে কিল চুরি করা। এই নেতারা কিছুদিন আগেও তৃণমূলের আন্দোলনে মদত দিলেন, সিপিএম-বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করেছেন। ফলে এই দুই দলের নিচের তলার কর্মীরা নিশ্চিতভাবে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, পূর্ব কলকাতায় আর এস পি কর্মীরা বরাবরই সিপিএম-এর বিরুদ্ধে পরেশ পালের পক্ষেই ভোট করে থাকে। উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রেও আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরা সিপিএম বিরোধী ভূমিকা নেবেন। পূর্ব কলকাতায় বর্তমান সিপিএম সাংসদের বিরুদ্ধে বহু মানুষ জনসরব। মহঃ সেলিম-কে জোট কর্মসূচীতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র প্রচারমুখী কর্মসূচীতেই দেখা যায়। সংখ্যালঘুদের উন্নয়ণের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু মহঃ সেলিমকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কাজেই সংখ্যালঘুদের মধ্যে মহঃ সেলিম আসর তৈরি করছেন।

এদিকে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট হওয়াতে — এই জোটে থেকেও এস ইউ সি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিচ্ছেন — পি ডি এস সৈফুদ্দিনকে যাদবপুরে দাঁড় করাচ্ছে। সি পি আই (লিবারেশ) গোষ্ঠী বিহারে সিপিএম এর সঙ্গে জোট বেঁধেছে আর পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিচ্ছে।

ঘাটালে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি নূরে আলম চৌধুরী। তিনি সিদ্দিকুল্লাহ-এর ভাই। প্রয়াত সিপিএম নেতা

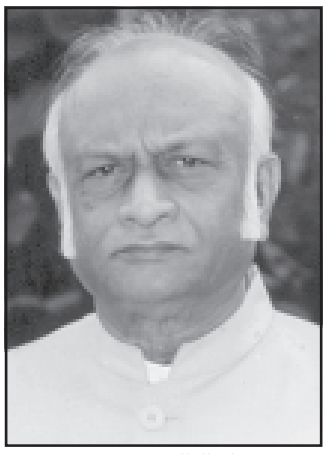

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

মনসুর হবিবুল্লাহ-এর জামাই। হবিবুল্লাহ মন্ত্রী এবং স্পিকারের কাজ করেছিলেন। নিজের মেয়েকে (নূরে আলম চৌধুরীর পত্নী) সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার হিসাবে বসিয়ে গেছেন। একটা জমি নিয়ে নাকি মতান্তর থেকে মনান্তর হয়েছে। ফলে একদা সিপিএম সদস্য নূরে আলম চৌধুরী তৃণমূলে। এহেন প্রার্থী সিপিএম-এর বিরুদ্ধে লড়বেন কি করে? এখানে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থীই বিকল্প।

রাজ্যে খুনের রাজনীতি চালাচ্ছে সিপিএম আর তৃণমূল মাওবাদী গোষ্ঠী। এরা কখনই রাজ্যে শান্তি আনতে পারে না। এইরাজ্যে শান্তি স্থিতি আনতে পারে বিজেপি। উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেন্দ্রীয়ভাবে কংগ্রেস বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে কোণঠাসা। কেন্দ্রে কংগ্রেসের আসতে পারা প্রায় অসম্ভব। একমাত্র বিজেপি তথা এনডিএ-এর কেন্দ্রে ক্ষমতা আসীন হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।

বাঁকুড়ায় তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হলেন সুব্রত মুখার্জি। ইনি কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূলে গিয়ে কলকাতার মেয়র হয়েছিলেন। এখন আবার কংগ্রেসে গেছেন। এক সময়ে মমতা ব্যানার্জি সুব্রত বাবুকে 'তরমুজ" বলেছিলেন। কলকাতার সিপিএম ঘেঁষা এক দৈনিকে এক নিবন্ধে সুব্রতবাবু লিখেছিলেন — "জ্যোতিবাবু আমার রাজনৈতিক পিতা।" সুব্রতবাবুর নেতৃত্বে এক আন্দোলনে নাকি রবীন্দ্রসদন আক্রান্ত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অয়েল পেন্টিং কাটা হয় বলে অভিযোগ আকারে প্রচার করা হয়েছিল। সুব্রত দল বদলের খেলায় মাতলেও আই এন টি ইউসি-এর নেতৃত্ব কখনও ছাড়েননি। কারণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থায় তিনি আই এন টি ইউ সি'র প্রতিনিধি হিসাবে থাকাটা চিরস্থায়ী করেছেন। সুব্রতবাবু সুবিধাবাদী সুযোগ সন্ধানী। তার কৌশল সম্পর্কে কিছু ঘটনা জানালাম।

কয়েকটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে যার ব্যাখ্যা আমি করতে পারিনি। যেমন, (১) সুব্রতবাবু যখন জোড়াবাগানে নির্বাচনী কাজে একজন পুলিশ অফিসারকে থাপ্পড় মারেন, সেই কেস তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নাকি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (২) ৩৫ নং রামমোহন সরণীতে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা হয় — একাধিক কংগ্রেস কর্মী আহত হন। কিন্তু এ ব্যাপারে সিপিএম সরকার কোনও পুলিশি ব্যবস্থা নেয়নি কেন? এই বাড়ির মালিক নাকি সোমেন মিত্র??

(এরপর ১৩ পাতায়)

অন্য রকম

ইসলামের রামায়ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা। মাঝ বয়সী এক যুবক এসে ইসলামকে ডাক দিল। "ইসলামদা, চলো সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। রামায়ণ আনা হয়েছে। হারমোনিয়ামেরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তুমি এসে পড়া শুরু করবে।" এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলো শেষ করেই যুবকটি বিদায় নিল। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের ইসলাম মহম্মদ। সে মুসলিম। দিনে পাঁচবার নিয়মিত নমাজ পড়ে — কোরাণ পাঠ করে। আবার রামায়ণও পড়ে। পাড়া-পড়শিদের প্রায়ই রামায়ণ পড়ে শোনায়। ইসলাম নিজে ইসলাম বলে কোনওদিন রামায়ণে অরুচি দেখায়নি। উল্টে রামায়ণে দখল এনেছে। রামায়ণ পাঠকে সে তার জীবনেরই অঙ্গ বলে মনে করে। তার নিজের মতে, রামায়ণ রাম-রহিম সবার জন্যই। তার কোনও জাতভেদ নেই।

অল্পদিনের মধ্যেই সে রামায়ণ পাঠকে করায়ত্ত করে। রামভক্ত হনুমানের হনুমান চল্লিশাও তার মুখস্থ। পাড়া-পড়শিদের অনুরোধে এই সব শুনিয়ে দিতে সেও মাহির। তার মুখে রামায়ণ পাঠ শুনে তাবড় তাবড় পণ্ডিতরাও ভাবমুখর হয়ে ওঠেন। জয় হো-জয় হো বলে ইসলামকে তারাও

এভাবেই রামায়ণ পাঠ করে শোনায় ইসলাম।

উৎসাহিত করেন।

ভজন-কীর্তনেও কম যায় না ইসলাম মহম্মদ। তার রামায়ণ পাঠের শুরুটাই ভজন-কীর্তন থেকে। একদিন ভজন-কীর্তনের আসরে কী হয় শুনতে গিয়েই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে সে। ওই আসরে রামায়ণ শুনে মনের শান্তির পথ খুঁজে পায় সে। তখনই নিজের মনে ঠিক করেছিল লোকের মুখে নয়, সে নিজেও রামায়ণ পড়বে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। অল্প দিনের মধ্যেই রামায়ণ পাঠে পণ্ডিত হয়ে উঠল ইসলাম। হারমোনিয়াম বাজিয়ে রামায়ণ, হনুমান চল্লিশা, ভজন-কীর্তনে লোককে মুগ্ধ করে সে। আর পাঁচটা গ্রামও তার মুখ থেকে এসব শুনতে ভালোবাসে। ভিন্ অঞ্চলেও ইসলামের ডাক পড়ে। মাঘী মেলায় তাকে ঘিরেই যেন মেলার আকর্ষণ তৈরি হয়। অহল্যা আশ্রমেও ইসলামের বেশ খাতির। সাধু-সন্ন্যাসীরা নিজেদের আধ্যাত্মিকভাবকে আরও উজ্জীবিত করে ইসলামের কণ্ঠস্বর শুনে।

ইসলাম এখন এসব ছাড়া বাঁচতে পারে না। মুম্বাইয়ে কয়েকদিনের জন্য একটা কাজে যোগ দিলেও, তাতে তার মনে টেকেনি। রামায়ণ, ভজন-কীর্তনের টানে আবার সে এলাহাবাদে ফিরে আসে। শুরু করে তার রামায়ণমুখী জীবন। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে সে আজও এসবের সঙ্গে যুক্ত। রামায়ণ পাঠ, হনুমান চল্লিশা শোনানো যেন তার ধর্মে পরিণত হয়েছে। ইসলাম এখনও ইসলাম। সেটা তার ধর্মে — উপাসনা পদ্ধতিতে। কিন্তু কর্ম-কর্তব্যে সে যেন হিন্দু। ধর্মসভায় তার ডাক পড়ে। আর পাঁচজন মহন্তদের সঙ্গে সেও একই সম্মান পায়। তার এই দেখাদেখিতে অনেক মুসলিমও তার সঙ্গী হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তার ভক্তের অভাব নেই। রামায়ণ যে জীবনমুখী, ইসলাম যেন পরোক্ষে তার নিজের জীবন দিয়ে সে কথাই তুলে ধরেছে। তার মনে কোনও গোঁড়ামি নেই, ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলারিজমের তত্ত্বকথা তার কানে ঢোকে না। সে এসব বুঝতেও পারে না। হয়তো বুঝতে চায়ও না।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই প্রমাণিত

বাম রাজত্বে আইন-শৃঙ্খলার বেহাল দশা ত্রিপুরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশজুড়ে কংগ্রেসের 'বি' টীম বলে কথিত বামপন্থীরা আবার ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে। বাজারে ছেড়েছে তৃতীয় ফ্রন্টের গাল-গল্প। রচয়িতা সেই সীতারাম ইয়েচুরি আর প্রকাশ কারাট জুটি। সঙ্গে বিভিন্ন কিসিমের বামপন্থীরা। তবে বামপন্থীরা যেখানে মধ্যমণি সেখানে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কেমন হয় তা বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্য ত্রিপুরার ক্রাইম রেকর্ডটা দেখলেই মালুম হবে। এই তথ্য ও পরিসংখ্যান গত ৯ মার্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নিজেই বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা রতনলাল নাথের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরে জানান, রাজ্যজুড়ে খুন, ধর্ষণ, বধূহত্যা, পণপ্রথার অত্যাচার, চুরি-ছিনতাই, মহিলা অপহরণ থেকে শ্লীলতাহানি — সবরকম অপরাধই বেড়ে চলেছে। ২০০৭-এর জানুয়ারি থেকে ২০০৯-এর জানুয়ারি পর্যন্ত উন্নততর বামফ্রন্টের ত্রিপুরী নমুনাটা এককালের বিহারকেও পিছনে ফেলে দেবার দাবি করতেই পারে।

গত দু'বছরে পণ-আদায়ের দাবিতে ৫৩ জন গৃহবধূকে হত্যা করা হয়েছে। পণসংক্রান্ত অত্যাচারের শিকার ১৩৩২ জন গৃহবধূ। খুনের সংখ্যা ২০৮ জন। অর্থাৎ প্রতি মাসে ১২ জন। ২০০৭ সালে খুনের সংখ্যাটা ছিল ১৩৮ জন। ২০০৮-এ খুন হয়েছেন ১৫৫ জন। গত জানুয়ারি মাসে খুন হয়েছেন ১৫ জন। শেষ ২৫ মাসে ধর্ষিতা হয়েছেন ৩৭৩ জন। প্রতি মাসে ১৫ জন মহিলা ধর্ষণের শিকার। গত ২৫ মাসে অপহৃতা হয়েছেন ১৯৮ জন মহিলা। ২০০৭-এ ৮১ জন

মানিক সরকার

মহিলা অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল। ২০০৮-এ অপহৃতার সংখ্যা ১০৮। রাজ্যে শ্লীলতাহানির ঘটনাও বাড়ছে — গত ২৫ মাসে ৬৩২ জন মহিলার শ্লীলতাহানি হয়েছে। ২০০৭-এ শ্লীলতাহানির ঘটনা ছিল ২৪৪টি। ২০০৮-এ বেড়ে হয়েছে ৩৪৬টি। গত জানুয়ারিতে ৪২টি শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। এই সময়সীমার মধ্যে চুরির ঘটনা ঘটেছে ৯৪৬টি। ডাকাতির ঘটনা ২৭টি। এইসব অপরাধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘটে চলেছে আত্মহত্যার ঘটনা। ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮ — এই তিন বছরে রাজ্যে আত্মহত্যা করেছেন মোট ২২২২ জন। এই আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ৯৩৩ জন মহিলা এবং ১২৮৯ জন পুরুষ। ২০০৬-এ আত্মহত্যার ঘটনা ৭৬৫টি। ২০০৭-এ ৭০৫ জন এবং ২০০৮ সালে ৭৫২ জন আত্মহত্যা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন রাজ্যে ১ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু নিরাপত্তা কর্মী ১১৮১ জন। এক একজন নিরাপত্তারক্ষীর জন্য বছরে গড়ে ব্যয় হয় ১ লক্ষ ৯ হাজার ৭৬ টাকা।

এতদ্ব্যতীত কেন্দ্র সরকার প্রতিবছর রাজ্য পুলিশের আধুনিকীকরণে অঢেল অর্থ দিচ্ছে।

গত আর্থিক বছরেই কেন্দ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা দিয়েছে। রাজ্য সরকারই টাকা খরচ করে উঠতে পারছে না। ব্যয় না করতে পারা অর্থের পরিমাণ (১০ ফেব্রুয়ারি ০৯) ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ২০০৭-০৮ বছরে রাজ্যে১৬৪০৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তাদের মধ্যে পুলিশ ১০,৩৯৩ জনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। প্রদত্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে পুলিশের খাতায় ৪৫ জন দাগি সমাজবিরোধী আছে। তাদের ৪৫ জনই রাজধানী আগরতলার বাসিন্দা আর ১০ জনের বাড়ি বিশালগড়ে।

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর চাঞ্চ ল্যকর স্বীকারোক্তি

কিছু অর্থলগ্নী সংস্থাই জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক

আশীষ কুমার দে ।। জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক ও অর্থদাতাদের নিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ দেশে ও দেশের বাইরে বহু হইচই হলেও তাদের তালিকায় যে বাংলাদেশেরই অনেক অর্থলগ্নি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, শেষ পর্যন্ত সরকারের মুখ থেকেই তা উচ্চারিত হল। খোদ অর্থমন্ত্রী আবুল খান

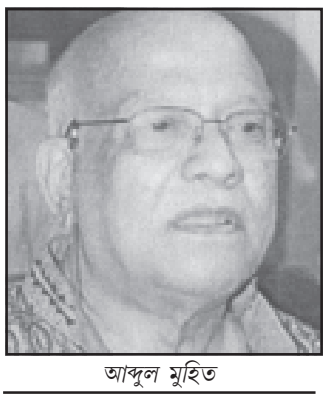

আব্দুল মুহিত

আব্দুল মুহিতঅভিযোগ করেছেন, সরাসরি জঙ্গিবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে বাংলাদেশে এই রকম অনেক বিনিয়োগকারী সংস্থার সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকার বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখে সংশিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলেও উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী মুহিত। ১৮ মার্চ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি বিগত বিএনপি জামাত জোট সরকারের দিকেও অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করেন। অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্য ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের একটি গবেষণা প্রতিবেদনেরই সমর্থন। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ওই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনীতির ছদ্মাবরণে পরিচালিত স্বাধীনতা বিরোধী একটি ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর বার্ষিক নিট মুনাফা ১২০৭ কোটি টাকা।

তবে বর্তমানে এই মুনাফার পরিমাণ দেড় হাজার কোটি টাকা বলে ড. বারকাত উল্লেখ করেন। ব্যাঙ্ক-বীমা, হাসপাতাল ও এনজিওসহ বিভিন্ন আর্থিক, বাণিজ্যিক ও কথিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা এই টাকা উপার্জন করে। এই টাকার ২০ শতাংশ ব্যয় করা হয় মৌলবাদী তৎপরতার পেছনে। জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই এই বিশেষ গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষীয় শক্তিসমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ এই অভিযোগ করে আসছে। এজন্য জামাতে ইসলামিকে সরাসরি অভিযুক্ত করেছেন অনেকে।

এছাড়া ইতিপূর্বে ইসলামী ব্যাঙ্কসহ বেশ কিছু সংখ্যক এনজিওর বিরুদ্ধে জঙ্গি তৎপরতায় অর্থ বিনিয়োগের জোরালো অভিযোগ উঠেছে। এসব এনজিও অধিকাংশই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জামাত পরিচালিত। আর সরাসরি জামাত কর্তৃক পরিচালিত হয় ইসলামী ব্যাঙ্ক।

(সৌজন্যে : ভোরের কাগজ, বাংলাদেশ)

মালদায় দুটি কেন্দ্রেই এবার বিজেপি প্রার্থী

উত্তরে অম্লান ভাদুড়ি ও দক্ষিণে দীপক চৌধুরী

তরুণ কুমার পণ্ডিত ।। এবারে মালদা জেলাতে লোকসভা আসনের পুনর্বিন্যাস হওয়াতে একটি আসন বেড়ে দুটি হয়েছে। ৭ মালদা উত্তর এবং ৮ মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি দু'জন যুবক প্রার্থী দিয়ে নতুন ভোটারদের মন জয় করতে সচেষ্ট হয়েছে। ৭ মালদা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে ইংলিশ বাজার মিউনিসিপ্যালিটির একমাত্র বিজেপি কাউন্সিলার অম্লান ভাদুড়িকে। তেমনি ৮ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে (দক্ষিণ) মালদা কোর্টের আইনজীবী দীপক চৌধুরীকে বিজেপি প্রার্থী করেছে। মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রটিতে মুসলিম ভোটার বেশি থাকলেও উত্তর মালদা হিন্দু প্রধান কেন্দ্র। ৭ মালদা কেন্দ্রে সিপিএম রাজ্যমন্ত্রী শৈলেন সরকারকে টিকিট দিলেও কংগ্রেস এখনও তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি। শোনা যাচ্ছে প্রয়াত বরকত গনিখানের বিদেশে থাকা ভাইকে টিকিট দেওয়ার জন্য সোনিয়ার কাছে আর্জি জানানো হলেও স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে আগ্রহী। উল্লেখ্য, বরকত গানিখান বেঁচে থাকাকালীন তাঁর প্রবাসী ভাই আবু নাশের খানের সঙ্গে তাঁর অহিনকুল সম্পর্ক ছিল। মালদা জেলাতে কংগ্রেস দলটি বরকত গানিখানের পরিবার কেন্দ্রিক হওয়ার অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সুজাপুর কেন্দ্রে বরকতের বোন দীর্ঘদিন এম এল এ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার মেয়ে এম এল এ হয়েছিল। বরকতের এক ভাই বর্তমান লোকসভা সংসদ। এরপরে আবার তার বিদেশী ভাইকে প্রার্থী করতে চাওয়াতে দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা হতাশ হয়েছেন। এদিকে জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি কংগ্রেসের গৌতম চক্রবর্তীকে এবার দল টিকিট না দেওয়াতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট হওয়ার জন্য এখন তিনি তলে তলে কংগ্রেসকে হারানোর জন্য সিপিএমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুড়ির আশা, এবারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য ভোটাররা বিজেপির দিকেই ঝুঁকবে। তাছাড়া বর্তমানের সহ সভাধিপতি বিজেপির মোহন টুডু তার নির্বাচন ক্ষেত্র থেকেই জিতেছে। উপরন্তু বাজপেয়ীর ৫ বছর শাসনে সুফল তো রয়েছেই। অপর দিকে ৮ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এবং বিজেপির জেলা সম্পাদক দীপক কুমার চৌধুরীর আশা কংগ্রেস এবং সিপিএম দুই দলই মুসলিম প্রার্থী দেওয়ায় একমাত্র হিন্দু প্রার্থী হিসাবে তাকেই এবারে এলাকার মানুষ ভোট দেবে। এখানেও ব্যাপক অনুপ্রবেশ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেআইনি অস্ত্রের বৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং রাস্তা ঘাটের চরম দুর্দশা — ভোটারদের বিজেপিতে ভোট দিয়ে কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। বিগত ৫ বছরে কংগ্রেস এবং সি পি এম রাজ্যে কুস্তি এবং কেন্দ্রে দোস্তি করে চললেও জেলার কোনও উন্নতি করেনি। সব মিলিয়ে মালদার দুটি কেন্দ্রে এবার ভোট যুদ্ধে জোর লড়াই।

শ্মশান দখলের ষড়যন্ত্র চলছে মালদায়

সংবাদদাতা ঃ মালদা ।। মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানগুলির পবিত্রতা নষ্ট করার পাশাপাশি শ্মশানগুলিকেও দখল করার চক্রান্ত চলছে। গত ৯ মার্চ মহানন্দা নদী সংলগ্ন একটি শ্মশানের জমি দখল নেওয়ার জন্য ১০-১৫ জন সশস্ত্র মুসলিম দুস্কৃতি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের ওপর চড়াও হয়। মালদা জেলার চাঁচল ২ নং ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নওদাপাড়াতে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। মহানন্দা নদীর ওপারে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার মারনাই থেকে মুসলিম দুস্কৃতিরা এসে ফুটবল খেলার ছলে বেশ কিছুদিন থেকে শ্মশান সংলগ্ন জমিতে হিন্দুদের মড়া পোড়াতে বাধা দেয় ও গালিগালাজ করে। কিন্তু ৯ মার্চ ইটাহার থানার মারনাইয়ের নমুদ্দিন আলি, উমর আলি, সাফি আলি ১০-১৫ জন যুবকসহ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফুটবল খেলার নাম করে জড়ো হয় এবং হিন্দুদের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ শুরু করে। সুশীল সরকার ও রাজেন দাস প্রতিবাদ করতে গেলে দুস্কৃতিরা বোম ও পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাঠে ৫-৬টি বোম ফাটায়। বোমার শব্দে গ্রামের মানুষ ছুটে এলে দুস্কৃতিরা পালিয়ে যায়। বোমের আঘাতে সুনীল সরকার ও রাজেন দাস গুরুতর জখম হয়ে প্রথমে চাঁচল হাসপাতালে এবং পরে মালদা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। বর্তমানে সুশীল সরকার মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। উল্লেখ্য, এই জায়গাটা নিয়ে এর আগে জেলা প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। চাঁচল থানার সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, ইটাহার থানাকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে। দুস্কৃতিদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবিতে স্থানীয় হিন্দুরা একতাবদ্ধ হয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাথে যোগাযোগ করেছে। ইতিপূর্বে মালদা জেলার বিভিন্ন স্থানে রাতারাতি খাস জমি দখল করে ইদগাহ ও মাজার তৈরি করাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু পুলিশ- প্রশাসন হিন্দুদের অভিযোগে কান দেয়নি।

তৃতীয় ফ্রন্টকে ভর করে সি পি এম সর্বভারতীয় ইমেজ ধরে রাখতে চাইছে

তারক সাহা

এবারের নির্বাচনে নেতাদের রঙ্গ শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যে-রাজ্যে আঞ্চ লিক দলগুলির বাড়-বাড়ন্ত মেদ বাড়িয়েছে প্রকাশ কারাতদের। সম্প্রতি বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ওড়িশার নবীন পট্টনায়কের বিজেডি প্রকাশদের তৃতীয় ফ্রন্টের স্বপ্নে ইন্ধন জুগিয়েছে। দেশের কিছু ব্রাত্য নেতা আপাতত প্রকাশের এই জোটে সামিল। জোটের জাল বোনা হলেও জট বিস্তর। নবীন ইতিমধ্যে তাঁর হাতের তাস দেখাতে নারাজ। ভোটের ফল শেষমেশ কী দাঁড়ায় সেই অবধি অপেক্ষা করবেন তিনি। আবার মায়াবতী তাঁর মায়াজাল বিস্তার করেছেন। উত্তরপ্রদেশের বহেন্‌জী দেশের প্রথম দলিত প্রধানমন্ত্রী হবার খোয়াব দেখছেন। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মনমোহন যে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, এমনটা আপাতত স্থির। কারণ রাহুলের হাতে এখনই ম্যাডাম ক্ষমতার জাদু দিতে নারাজ। এখনও পরিণত নন তিনি। এবারেও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা কম বুঝতে পেরে মারাঠি স্ট্রংম্যান শরদ পাওয়ার কখনও শিবসেনা, আবার কখনও তৃতীয় ফ্রন্টে সামিল হওয়ার হুমকির মাধ্যমে ম্যাডামকে বার্তা পাঠাচ্ছেন। আবার দেশের রাজনীতিতে একেবারেই ব্রাত্য দেবেগৌড়াও চাইছেন তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করতে। এমন সব অবাস্তব কাল্পনিক রাশি নিয়ে সমীকরণ গড়তে চাইছেন রাজনীতির গণিত শিক্ষক প্রকাশ কারাত।

কিন্তু প্রকাশ কারাত কেন এত তৎপর? কারণ কংগ্রেস ইতিমধ্যে মমতার ফরমূলা ২৮-১৪ মেনে নিয়ে এরাজ্যে তৃণমূলের লেজুড়। অনেক টালবাহানা, নেতাদের অসন্তোষ (প্রণবেরও) সামলে সোনিয়াজী রাজি এরাজ্যে তৃণমূলের লেজুড় হতে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সাফল্যে উজ্জীবিত মমতা এরাজ্যে রাজনীতির ছড়ি ঘোরাচ্ছেন একনায়কের মতো। '৯৯ সালে যে সোমেনের জন্য মমতা কংগ্রেস ছাড়লেন, সেই সোমেন আজ তার আঁচলের আড়ালে।

এবার এরাজ্যে বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের হাল বেশ খারাপ। অঘটন না ঘটলে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের আসন কমতে পারে অর্দ্ধেক বা তারও নীচে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ নির্ভর সিপিএম অশনি সংকেত বুঝতে পেরে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়তে তৎপর। কেননা কংগ্রেস নিশ্চিত নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পেলে, সিপিএমের নেতৃত্বাধীন তৃতীয় ফ্রন্টের ভূমিকা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। আরেকটা ব্যাপার যেটা আরও তাপর্যপূর্ণ তা হল — সাতাত্তরে জয়প্রকাশের আন্দোলনের কাঁধে ভর দিয়ে সিপিএম বাংলার ক্ষমতায় এসে দীর্ঘ বত্রিশ বছর শাসন চালাচ্ছে, একমাত্র সংগঠিত বিরোধী দলের অভাবে এবং তাও মাত্র ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে। সিপিএম এমনই একটা মঞ্চ খুঁজছে যাতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যার বা যাদের কাঁধে ভর করে একটা সর্বভারতীয় ইমেজ ধরে রাখতে পারে। নইলে এবারের লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেডি বা আর জে ডি-র মতো সি পি এম-ও আঞ্চ লিক দলে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

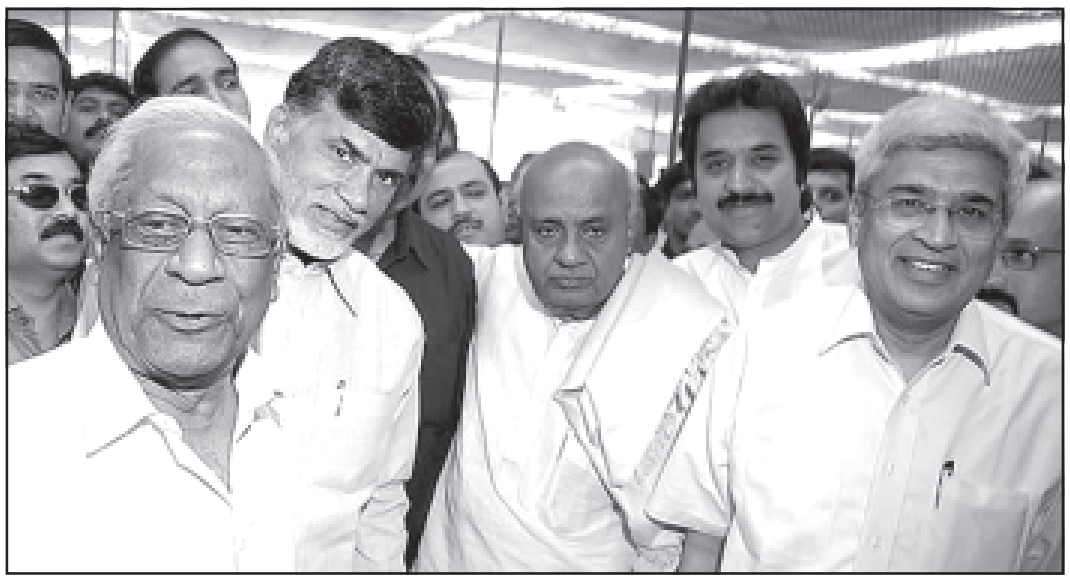

এতদিন অ-বাম দলগুলিকে সিপিএম বুর্জোয়া দল বলে গালমন্দ করত। এরা বলত এরা আগমার্কা কম্যুনিস্ট আদর্শবাদী দলও এখন বুর্জোয়া দলে পরিণত। বুর্জোয়া দলের সব গুণই এখন এদেশের কম্যুনিস্ট দলে রয়েছে। দলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসী নেতারা যেমন বিদ্রোহ করে অন্য দলে যোগ দেয়, তেমন ঘটনাও ঘটেছে সিপিএম-ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি-তে। আবার কেরলে পোন্নামি কেন্দ্রটিতে এবার সি পি এম প্রার্থী দিতে চাওয়ায় সি পি আই এমনভাবে বেঁকে বসেছে যে, বামফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবার উপক্রম। বুর্জোয়া দলের মতো কারাতকে সমঝোতা করতে হল মাথা নত করে।

অন্যত্র তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ায় সোনিয়াজী প্রণবকে ব্যবহার করলেন পরোক্ষে, সিপিএমের সমালোচনা করতে। একদা আগমার্কা বামপন্থী কংগ্রেসী বলে পরিচিত প্রণববাবুকে ব্যবহার করা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা যে কোনও ঘোষণা বা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানত সিংভি, জয়ন্তী নটরাজন বা জয়রাম রমেশের মতো ব্যক্তিরা। এবারে প্রণববাবুকে ব্যবহার করাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আবার এরাজ্যে স্বাভাবিকভাবে জোট গড়ার বিষয়ে রাজ্য সভাপতি হিসেবে সোনিয়া প্রণবকে ব্যবহার না করে, ভিনরাজ্যের কেশবরাওকে ব্যবহার করেছেন। মমতা-পূজায় কেশবরাও প্রধান পুরোহিত, আর প্রণব হলেন তন্ত্রবাহক। অর্থাৎ প্রণবকে কাজে লাগাননি সোনিয়া। এতে জোটের জট আরও জটিল হয়ে ভেস্তে যেত। অথচ সোনিয়া পরমাণু চুক্তিতে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন বাম নেতাদের চরিত্র। যদি বামেরা ধৈর্য্য ধরে পরমাণু চুক্তি মেনে নিত, তবে এরাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল যে এত কাছাকাছি আসত না এটা বলা যায়। তৃতীয়ত, সোনিয়া চাইছেন নিজের বলে বলীয়ান হয়ে সরকার গড়ার কথা। মমতা তো ঝাঁকের কই, সুতরাং তাঁকে তাঁবে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। চতুর্থত, আগামী বছরগুলি হল এই রাজ্যে নির্বাচনের বছর। ২০১০-এ কলকাতা পুর-নির্বাচন, ২০১১-তে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সুতরাং বিক্রমের ঘাড়ে চেপে তার কার্য পরিচালনা করতে চায় বেতালরূপী কংগ্রেস। পঞ্চ মত, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রণববাবুরা ব্রাত্য হয়ে যাবেন বয়সের কারণে, কংগ্রেসী পতাকা বইবেন রাহুলরা এবং এইসব তরুণ প্রজন্ম ঘোর সিপিএম বিরোধী। সুতরাং একটা সদর্থক বার্তা পাঠাতে চাইছেন সোনিয়া এ রাজ্যে।

এরাজ্যে এস ইউ সি আই-তৃণমূল-কংগ্রেস জোট আবার পরস্পর বিরোধী। একদা বামদল হিসেবে এস ইউসি-এর বেশ সুনাম। তারা আবার কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে কী করে! এ যাবৎ বিধানসভায় দু-একটা আসন থাকলেও সংসদে এবারে একজন প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ উজ্জ্বল। কিন্তু কংগ্রেস তনয়া মমতার সঙ্গে সমঝোতা হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে নৈব নৈব চ। সুতরাং এস ইউ সি আই তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দিলেও, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বেশ কয়েক জায়গায় প্রার্থী দিয়েছে। এমনই সব পরস্পর বিরোধী জোটের খেলা চলছে দেশজুড়ে।

ওড়িশায় মাওবাদীদের হাতে খুন সঙ্ঘের কার্যকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মাওবাদী দুস্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন ওড়িশার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বান্দাপিপলি গ্রামের সঙ্ঘ-কার্যকর্তা প্রভাত পাণিগ্রাহী। গত ১৯ মার্চ ২০ জনের এক মাওবাদী দল তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। গত বছর ২৩ আগস্ট স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে হত্যার পর থেকেই মাওবাদীদের নিশানায় ছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ওই ঘটনার পর থেকেই মাওবাদী শিবির মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মাওবাদী গোষ্ঠী পুরোপুরি খৃস্টান প্রভাবিত চার্চের অঙ্গুলি হেলনেই তাদের কর্মসূচী পরিচালিত হয়। প্রভাত পানিগ্রাহীকে হত্যার পিছনে খৃস্টান প্রভাবিত মাওবাদীদেরই যোগসাজস রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

মাওবাদী হামলায় বিধ্বস্ত বসতবাড়ি।

এদিন ওই মাওবাদী দল রাত দুটো নাগাদ প্রভাত পাণিগ্রাহীর ওপর হামলা চালায়। প্রভাত তখন রুধিগ্রামের কোটাগুড়ি ব্লকের স্থানীয় কার্যকর্তা ধ্রুব ভারতীর বাড়িতে প্রবাসে ছিলেন। তিনি সেদিন ওই গ্রামে সঙ্ঘের শাখা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। মাওবাদীরা পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ওই কার্যকর্তার বাড়িতে হামলা চালায়। প্রভাত পাণিগ্রাহীকে হত্যার জন্য তারা রবি জেনা নামে আর এক স্থানীয় কার্যকর্তার বাড়িতেও হামলা চালায়। পুলিশ যাতে ঘটনাস্থলে না পৌঁছাতে পারে সেজন্য দুস্কৃতীরা গাছ ফেলে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছিল। পুলিশ রাস্তা সাফ করে পৌঁছতে পৌঁছাতে প্রভাতকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

পুলিশ এই হত্যার পিছনে মাওবাদীদের হাত রয়েছে বলেই প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। সঙ্ঘের স্থানীয় কার্যকর্তারা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই নৃশংস হত্যার পিছনে খৃস্টানদের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে।

প্রভাত পাণিগ্রহীকে গত বছর ২৩ আগস্টের ঘটনার মামলায় জড়িয়ে খৃস্টানরা জেল হেফাজতে পাঠায়। ১৪ মার্চ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই খৃস্টান মাওবাদীদের টার্গেট ছিলেন তিনি। এই ঘটনায় স্থানীয় সঙ্ঘ ও সংশ্লিষ্ট মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ চিরুণী তল্লাশি শুরু করলেও, এর কিনারা কতটা হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

লালু-রাবড়ির মন্দির নির্বাচন নির্বাচন কমিশনারের কোপে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এদেশের নেতা-নেত্রীদের নামে মন্দির তৈরির ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। আকছার কোনও না কোনও ভক্তের প্রিয় জনপ্রতিনিধির নামে মন্দির তৈরির খবর প্রায়ই নজরে আসে। পিছনে ভক্তরূপী সাধারণ মানুষের সহযোগিতা, সক্রিয়তা কাজ করলেও, নেতারা খুব সহজেই মন্দিরে তাদের জায়গা পাকা করে ফেলেন। সব দলেই এই একই চিত্র। এতদিন মন্দিরে জায়গা পাওয়ার ইঁদুর দৌড়ে বাকি ছিলেন আর জে ডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর স্ত্রী বাবড়িদেবী। এই মাসের শুরুর দিকে সে আশা পূরণে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিলেন লালু ভক্ত রাজেন্দ্র যাদব। বিহারের রোহটাস জেলার রাজেন্দ্রর মন্দির তৈরির বাসনা ছিল অনেকদিন থেকেই। মন্দির তৈরির জন্য ২,৮০০ স্কোয়ার ফিট জায়গা দান করেন খোদ রাজেন্দ্র যাদবের মা মুখিয়া দেবী। ভূমি পূজনের পর মন্দির তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল। মুখিয়া দেবী লালু প্রসাদ যাদবের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর

(এরপর ১৩ পাতায়)

ভারতের রাজনীতিতে তরুণ সাংসদদের অবস্থান হতাশাজনক

সতীনাথ রায়

ভারতের রাজনীতিতে যুবকদের এগিয়ে আসার বিষয়টি এই দশকের শুরু থেকে খুব বেশি করে উঠে আসছে। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর প্রায় বেশিরভাগ দলের মধ্যেই যুব নেতৃত্বকে সামনে আনার ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ অবশ্য এতে তেমন কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। আমাদের দেশে যুব নেতৃত্বের অভাবটা আজকের নয়। লোকসভার শুরুর দিকে যুব নেতৃত্বের মুখ কিছুটা দেখা গেলেও, রাজনীতির পরিকাঠামোর অভাবে তা ধীরে-ধীরে তলানীতে এসে ঠেকেছে। মূলত রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় সচেতন যুবকদের প্রতি উদাসীনতাই এই করুণ অবস্থার জন্য দায়ী। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় কোনও দলেই যুব নেতৃত্বকে সঠিক দিশা দেওয়ার জন্য তেমন কোনও কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয় না। উলটে তাদের দলীয় কর্মসূচীর মধ্যে একরকম জোর করে জুড়ে দেওয়া হয়।

এমন নয় যে ভারতের যুবকদের অভাব রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের গর্বের ভারতে তা কোনও দিনই ছিল না। আজও না। এদেশের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশেরও বেশি নাগরিকের গড় বয়স ৪০ বছরেরও কম। অথচ ভারতের মতো বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক চিত্রটা হাতাশাজনক। ভারতের ৮০ শতাংশ রাজনীতিকের গড় বয়স ৭০ বছর। একপ্রকার বয়স্কদের হাতেই রাজনীতির চালিকাশক্তি রয়েছে বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। লোকসভার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, প্রথম লোকসভার সময় সদস্যদের গড় বয়স ছিল ৪৬ বছর। কিন্তু এর পর থেকেই বয়সের গড় আয়ু ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রয়োদশ লোকসভার দিকেই তাকিয়ে দেখুন না। সাংসদদের গড় বয়স ছিল ৫৫ বছর। বর্তমানে ৪৫ বছর বয়সী সাংসদের সংখ্যা ৯০ জন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের মধ্যে খুব কমজনই আছেন, যাদের রাজনীতিতে বারো মাস মুখ দেখা যায়। সংসদেও তাদের উপস্থিতি সন্তোষজনক নয়। 'পিআরএস ইন্ডিয়া' রিপোর্ট'-এ দেখা যাচ্ছে লোকসভা অধিবেশন চলাকালীন যুবক সাংসদদের উপস্থিতির সংখ্যাও কম। ১১ শতাংশ যুবক সাংসদদের মধ্যে লোকসভার বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন মাত্র ৭ শতাংশ সাংসদ। অন্যদিকে ৭০ বা তদূর্ধ বয়সী সাংসদদের সংখ্যা যেখানে ১০ শতাংশ সেখানে লোকসভার অধিবেশনে তাদের অংশগ্রহণও বেশি। ১০ শতাংশ উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বাজেট অধিবেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যুবক সাংসদদের উপস্থিতি ছিল সব থেকে কম। প্রশ্ন জাগে, যে তরুণদের ওপর জনগণ ভরসা করেছেন, সংসদের অভ্যন্তরে তাদের ভূমিকা কীরকম ছিল। ৪০ বছর বয়সের নীচে এই সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা কী আদৌ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছেন। এখানে কয়েকজনের ভূমিকা তুলে ধরা হল।

যোগী আদিত্যনাথ ঃ বিজেপির তরুণ সাংসদ। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর থেকে নির্বাচিত। জন্ম ঃ ৪ জুন ১৯৭২। তিন তিনবার পরপর নির্বাচিত। ২০০৭-এর আগস্ট থেকে তিনি দলের স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার। সংসদে প্রশ্ন-উত্তর কালাংশে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। লোকসভার অধিবেশনে ৬৬টি প্রশ্ন তিনি তুলে ধরেছেন।

শ্রীযোগী চতুর্দশ লোকসভার অধিবেশনে নেপালে মাওবাদী অসন্তোষ বিষয়ে সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনগণের হয়ে সংসদে প্রশ্ন করতে তিনি কখনও কালক্ষেপ করেননি।

মিলান্দ দিওরা ঃ কংগ্রেসের যুব এমপি। দক্ষিণ মুম্বাই থেকে নির্বাচিত। জন্ম ঃ ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৬। প্রথমবার এমপি। বর্তমানে দলের স্ট্যান্ডিং কমিটিতেও তিনি নিজের স্থান করে নিয়েছেন। সংসদের বিতর্কে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। মুম্বাই আক্রমণের পর তিনিই দলের

একমাত্র তরুণ এমপি, যিনি সংসদের ২৬/১১-হামলা সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রাজনীতি কিছু করে দেখানোর পথ বলে মনে হয়েছিল বলেই শ্রীদিওরা এই পথে আসেন।

কিরেণ রিজিজু ঃ লোকসভার আর এক তরুণ মুখ। বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত। পশ্চিম অরুণাচলপ্রদেশ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। জন্ম ঃ ১৯

নভেম্বর ১৯৭১। লোকসভার অধিবেশনে তিনি সব থেকে বেশি সক্রিয় ছিলেন। সংসদে চীনের সৈন্যদের অনধিকার প্রবেশ নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অধিবেশনগুলিতে তিনি ৯০টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

সন্দীপ দীক্ষিত ঃ পূর্ব-দিল্লী থেকে নির্বাচিত, কংগ্রেসের তরুণ সাংসদ। সন্দীপ দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত-এর পুত্র। তিনি প্রথমবার এমপি। দলের নীরব অথচ সক্রিয় কর্মী হিসাবে তার বেশ খ্যাতি রয়েছে। ২০০৫-

এর বাজেট অধিবেশন ও ২০০৭-এর দিল্লীর আলোচনায় সংসদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, অবশ্য অন্য অধিবেশনগুলিতে তার উপস্থিতি ছিল খুবই কম।

রঘুরাজ সিং শাকিয়া ঃ সমাজবাদী পার্টির তরুণ মুখ। উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্য। বয়স ৪০ বছর। দু-দুবার তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর ক্রিকেট ও ভলিবল প্রীতির জন্যই বেশ নাম রয়েছে। সংসদে অবস্থান অপ্রীতিকর। জনগণের

প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তেমন কোনও কাজ করতে পারেননি বলেও অনেকের অভিমত। চর্তুদশ লোকসভা অধিবেশনে তিনি মাত্র ৪১টি প্রশ্ন সংসদে তুলে ধরেন।

আসাবুদ্দিন ওয়াসিম ঃ অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল পার্টির পক্ষ থেকে তিনিই একমাত্র লোকসভার সদস্য। দলের ও লোকসভার তরুণ মুখ। হায়দরাবাদ

থেকে জয়ী। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে তিনি নতুন সংযোজন। বয়স ৪০ বছর। লোকসভার অধিবেশনে ওয়াসিন ৫১টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

রাহুল গান্ধী ঃ নেহরু-গান্ধী পরিবারের তরুণ সাংসদ হিসাবে মিডিয়ার নজর কেড়েছেন। কিন্তু সংসদের অধিবেশনে তার অবস্থান সন্তোষজনক নয়। জন্ম ঃ ১৯৭০।

লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন রাহুল মাত্র ৫ বার উপস্থিত ছিলেন। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সংসদের ভিতর তার অবস্থান সত্যিই হতাশ করে।

অখিলেশ যাদব ঃ সমাজবাদী পার্টির তরুণ সাংসদ। সংসদের বির্তক চলাকালীন তিনি খুব সামান্য সময় ব্যয় করেছেন। আমাদের দেশে সংসদের অধিবেশনে

প্রতি এক মিনিট অধিবেশনের খরচ ২৩ হাজার ৮৩ টাকা। কিন্তু এই তরুণ সাংসদ সংসদে মাত্র ১টি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। লোকসভার অধিবেশনে তার এই ভূমিকায় সাধারণ মানুষও রীতিমতো বিস্মিত।

সচিন পাইলট ঃ কংগ্রেস দলের নতুন মুখ। ১৯৭৭ সালে সচিনের জন্ম। রাজস্থানের ডুসা থেকে নির্বাচিত,

লোকসভা সদস্য। খবরের শিরোনামে তার অবস্থান ভালো থাকলেও, লোকসভার অধিবেশনে তার বরাবরই অরুচি দেখা গেছে। মাত্র ১৪ বার সংসদের অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন। রাজস্থানের গুজ্জর অসন্তোষে তিনি মিডিয়ার

লোকসভা নির্বাচন ঃ এক নজরে পরিসংখ্যান — ১৯৫১ - ২০০৪

সাল	১৯৫১	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৬৭	১৯৭১	১৯৭৭	১৯৮০	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৯	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০৪
আসন	৪৮৯	৪৯৪	৪৯৪	৫২০	৫১৮	৫৪২	৫৪২	৫৪১	৫২৯	৫৩৭	৫৪৩	৫৪৩	৫৪৩	৫৪৩
সংরক্ষিত	৯৮	১০৭	১০৯	১১৪	১১২	১১৬	১২০	১১৯	১১৭	১২০	১২০	১২০	১২০	১২০
প্রার্থী	১,৮৭৪	১,৫১৯	১,৯৮৫	২,৫৬৯	২,৭৮৪	২,৪৩৯	৪,৬২৯	৫,৪৯২	৬,১৬০	৮,৭৪৯	১৩,৯৫২	৪,৭৫০	৪,৬৪৮	৫,৪৩৫
জাতীয় দল গুলির সংখ্যা	১৪	৪	৬	৭	৮	৫	৬	৭	৮	৯	৮	৭	৭	৬
প্রাপ্ত ভোট	৭৬.০	৭৩.১	৭৮.৫	৭৬.১	৭৭.৮	৮৪.৭	৮৫.১	৭৭.৯	৭৯.৩	৮০.৬	৬৯.১	৬৮.০	৬৭.১	৬২.৯
আঞ্চ লিক দলের সংখ্যা	৩৯	১১	১১	১৪	১৭	১৫	১৯	১৯	২০	২৮	৩০	৩০	৪০	৩৬
প্রাপ্ত ভোট	৮.১	৭.৬	৯.৩	৯.৭	১০.২	৮.৮	৭.৭	১২.০	৯.৩	১৩.১	২২.৪	১৮.৮	২৬.৯	২৮.৯
ভোটদানে সক্ষম	১৭.৩	১৯.৪	২১.৪	২৪.৯	২৭.৪	৩২.২	৩৫.৬	৪০.০	৪৯.৯	৫১.২	৫৯.৩	৬০.৬	৬১.৯	৬৭.২
ভোটের হার	৪৪.৯	৪৫.৪	৫৫.৪	৬১.০	৫৫.৩	৬০.৫	৫৬.৯	৬৪.০	৬২.০	৫৫.৯	৫৭.৯	৬২.০	৬০.০	৫৮.১
পোলিং বুথ	নেই	নেই	২৩৮০৩১	২৪৩৬৯৩	৩৪২৯১৮	৩৭৩৯১০	৪৩৬৮১৩	৫০৬০৫৮	৫৮০৭৯৮	৫৯১০২০	৭৬৭৪৬২	৭৭২৬৮১	৭৭৪৬৫১	৬৮৭৪৭৩
খরচ (কোটি)	১০.৫	৫.৯	৭.৩	১০.৮	১১.৬	২৩.০	৫৪.৮	৮১.৫	১৫৪.২	৩৫৯.১	৫৯৭.৩	৬৬৬.২	৮৮০.০	১,৩০০.০

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মহিলা প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন লোকসভা ভোটে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দলের মহিলা প্রার্থীরাও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ নিয়ে লোকসভায় নানা ঘটনা ঘটলেও, দেখা যাচ্ছে মহিলারা কিন্তু এখনও বেশ ব্রাত্যই। বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলে। তাদের প্রার্থী তালিকায় জ্যোতির্ময়ী সিকদার ছাড়া আর কোনও মহিলার নামই নেই। মহিলাদের প্রার্থী করার ব্যাপারে সব থেকে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের প্রার্থী তালিকায় স্বয়ং মমতাকে নিয়ে পাঁচ জন মহিলা প্রার্থী

রয়েছেন। এরপর রয়েছে বিজেপির স্থান। বিজেপির তিন জন মহিলা প্রার্থী এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কংগ্রেসে রয়েছেন দীপা দাসমুন্সী।

জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৫০ সালের ১৬ অক্টোবর ভবানীপুরে। স্যার রমেশ মিত্র হাইস্কুল থেকে ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৬৯ সালে উমেশ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে ১৯৭২ সালে স্নাতক হন। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি উদ্বুদ্ধ হন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আদর্শে। ১৯৯০ সালে যোগদান বিজেপিতে। ১৯৯৫ সালে তিনি বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য হন। দক্ষিণ কলকাতায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এবার তিনি দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপি প্রার্থী।

ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার দীর্ঘদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ পরিবৃত্ত। আগে কংগ্রেস করতেন, তৃণমূলের জন্মের সময় থেকে মমতার হাত ধরেই তৃণমূলে। নির্বাচনে আগে লড়েছেন কিন্তু জিততে পারেননি। নলজাতক গবেষণায় জড়িত বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাকলি এবার নির্বাচনে বারাসাতে তৃণমূলের প্রার্থী।

নন্দীগ্রামের মেয়ে **শিউলি** বিয়ের আগে ছিলেন খাঁড়া এখন সাহা। নন্দীগ্রাম সীতারাম কলেজের ছাত্রী, ছাত্র পরিষদের দাপুটে নেত্রী শিউলি এবার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী। স্বভাব চরিত্রে প্রতিবাদী মেয়েটি বাপের বাড়িতে থেকে নিজের চোখে দেখেছেন ভয়ঙ্কর অপারেশন নন্দীগ্রাম। তাঁর মা বনশ্রী খাঁড়া এখন নন্দীগ্রাম এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

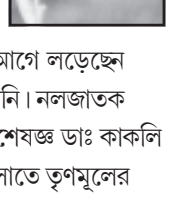

শতাব্দী রায়ের নাম তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় দেখে চমকে উঠেছেন অনেকেই। শতাব্দীর নিজের কথায় রাজনীতিটা আসলে আমার কাছে অভিনয়ের মতো। শতাব্দী কবিতা লিখতেও ভালোবাসেন। কলকাতার দেজ পাবলিসিং থেকে তাঁর কবিতার কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। এবার তিনি বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী।

উত্তরবঙ্গের মমতা **দীপা দাসমুন্সী,** তৃপ্তি মিত্রের অন্যতম সেরা ছাত্রী। বিখ্যাত বহুরূপী নাট্যদলের 'আগুনের পাখি' নাটক ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম মাইলস্টোন। সেই নাটকের একটি শো দেখতে গিয়েছিলেন প্রিয় দাসমুন্সী। সেখানেই আলাপ, পরে পরিণয়। রাজনীতিতে আসা, তারপর বিধায়ক হয়েছেন। এবার প্রিয়দাস মুন্সীর অনুপস্থিতিতে তিনি রায়গঞ্জে কংগ্রেসের প্রার্থী।

সিপিএমের সবে ধন নীলমনি মহিলা প্রার্থী **জ্যোতির্ময়ী সিকদার।** কৃষ্ণনগরের সাংসদ রয়েছেন, অথচ অনেকেই পাঁচ বছর কৃষ্ণনগরে তাকে দেখতেই পাননি। জন্ম দেবগ্রামে।পাঁচ বছরে তাঁকে নিয়ে অনেক বিতর্ক ও কেলেঙ্কারী ঘটেছে। বিখ্যাত দৌড়বিদ হলেও, রাজনীতির দৌড়ে তিনি ব্যর্থ। তবু এবারও তিনি কৃষ্ণনগরে সিপিএম প্রার্থী।

এবারও তিনি কলকাতা-দক্ষিণের প্রার্থী। যে কেন্দ্রের ওপর দৃষ্টি থাকে গোটা ভারতের। সিপিএম নামক বিশাল সংগঠনের বিরুদ্ধে যে মহিলা দীর্ঘদিন ধরে একা লড়াই করার নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।**

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাশ নাগের কন্যা শ্রীরামপুরের বর্তমান বিধায়ক রত্না নাগ দে হুগলিতে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। রাজনীতিতে আরও দুই নতুন মুখ রাজশ্রী চৌধুরি ও পলি মুখোপাধ্যায় প্রার্থী হয়েছেন তমলুক ও হাওড়া কেন্দ্র থেকে। বিজেপির এই দুই মহিলা প্রার্থী প্রচারেও নেমে পড়েছেন।

এলাকা পুনর্বিন্যাসের (ডিলিমিটেশন) পর কোন লোকসভা কেন্দ্রের আওতায় কী কী বিধানসভা কেন্দ্র

১. কোচবিহার (তফসিলি জাতি)	মাথাভাঙা, উত্তর কোচবিহার, দক্ষিণ কোচবিহার, শীতলকুচি, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি
২. আলিপুরদুয়ার (তফসিলি উপজাতি)	তুফানগঞ্জ, কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাদারিহাট, নাগরাকাটা
৩. জলপাইগুড়ি (তফসিলি জাতি) ফুলবাড়ি,	মেখলিগঞ্জ, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ-দক্ষিণ, ডাবগ্রাম-মাল
৪. দার্জিলিং	কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, চোপড়া
৫. রায়গঞ্জ	ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ
৬. বালুরঘাট	ইটাহার, কুশমণ্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর
৭. মালদহ উত্তর (নতুন আসন)	হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, হরিশচন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া, মালদহ
৮. মালদহ দক্ষিণ (নতুন আসন)	মানিকচক, ইংলিশ বাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, ফরাক্কা, সমরেশগঞ্জ
৯. জঙ্গিপুর	সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, নবগ্রাম, খড়গ্রাম
১০. বহরমপুর	বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, নওদা
১১. মুর্শিদাবাদ	ভগবানগোলা, রাণিনগর, মুর্শিদাবাদ, হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গি, করিমপুর
১২. কৃষ্ণনগর হু	তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর-উত্তর, নবদ্বীপ
১৩. রানাঘাট (তফঃ জাতি) (নতুন আসন)	কৃষ্ণনগর-দক্ষিণ, শান্তিপুর, রানাঘাট-উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট-উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট-দক্ষিণ, চাকদহ
১৪. বনগাঁ (তফসিলি জাতি) (নতুন আসন)	কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদা, বনগাঁ-উত্তর, বনগাঁ-দক্ষিণ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর
১৫. বারাকপুর	আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, বারাকপুর
১৬. দমদম	খড়দহ, দমদম-উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরানগর, দমদম, রাজারহাট-গোপালপুর
১৭. বারাসাত	হাবড়া, অশোকনগর, রাজারহাট-নিউটাউন, বিধাননগর, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, দেগঙ্গা
১৮. বসিরহাট	বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট-দক্ষিণ, বসিরহাট-উত্তর, হিঙ্গলগঞ্জ
১৯. জয়নগর (তফসিলি জাতি)	গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর, ক্যানিং-পশ্চিম, ক্যানিং-পূর্ব, মগরাহাট পূর্ব
২০. মথুরাপুর (তফসিলি জাতি) হু	পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার, মগরাহাট-পশ্চিম
২১. ডায়মন্ড হারবার হু	ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ
২২. যাদবপুর হু	বারুইপুর-পূর্ব, বারুইপুর-পশ্চিম, সোনারপুর-দক্ষিণ, ভাঙড়, যাদবপুর, সোনারপুর-উত্তর, টালিগঞ্জ
২৩. কলকাতা দক্ষিণ	কসবা, বেহালা-পূর্ব, বেহালা-পশ্চিম, কলকাতাবন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ
২৪. কলকাতা উত্তর (নতুন আসন)	চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর বেলগাছিয়া
২৫. হাওড়া	বালি, হাওড়া-উত্তর, হাওড়া-মধ্য, শিবপুর, হাওড়া-দক্ষিণ, সাঁকরাইল, পাঁচলা
২৬. উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া-পূর্ব, উলুবেড়িয়া-উত্তর, উলুবেড়িয়া-দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়ণপুর
২৭. শ্রীরামপুর	জগৎবল্লভপুর, জগাছা, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চণ্ডীতলা, জাঙ্গিপাড়া
২৮. হুগলি হু	সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, ধনেখালি
২৯. আরামবাগ (তফসিলি জাতি)	হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল, চন্দ্রকোণা
৩০. তমলুক	পাঁশকুড়া-পূর্ব, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, তমলুক, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম
৩১. ঘাটাল (নতুন আসন)	পাঁশকুড়া-পশ্চিম, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, কেশপুর
৩২. কাঁথি-চন্ডীপুর	পটাশপুর, কাঁথি-উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি-দক্ষিণ, রামনগর
৩৩. ঝাড়গ্রাম (তফসিলি উপজাতি)	নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, শালবনী, বিনপুর, বান্দোয়ান
৩৪. মেদিনীপুর	এগরা, দাঁতন, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর-টাউন, নারায়ণগড়, খড়্গপুর, মেদিনীপুর
৩৫. পুরুলিয়া	বলরামপুর, বাঘমুণ্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর, পাড়া
৩৬. বাঁকুড়া	রঘুনাথপুর, শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রায়পুর, তালডাংরা, বাঁকুড়া
৩৭. বিষ্ণুপুর (তফসিলি জাতি)	বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী, খণ্ড ঘোষ
৩৮. বর্ধমান পূঃ (তফঃ জাঃ) (নতুন আসন)	রায়না, জামালপুর, কালনা, মেমারি, পূর্বস্থলি-দক্ষিণ, পূর্বস্থলি-উত্তর, কাটোয়া
৩৯. বর্ধমান-দুর্গাপুর (নতুন আসন) হু	বর্ধমান-দক্ষিণ, মন্তেশ্বর, বর্ধমান-উত্তর, ভাতার, গলসি, দুর্গাপুর-পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম
৪০. আসানসোল হু	পাণ্ডবেশ্বর, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল-দক্ষিণ, আসানসোল-উত্তর, কুলটি বারাবনি
৪১. বোলপুর (তফসিলি জাতি) হু	কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউসগ্রাম, বোলপুর, নানুর, লাভপুর, ময়ূরেশ্বর
৪২. বীরভূম	দুবরাজপুর, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, হাসন, নলহাটি, মুরারই

সস্তার রাজনীতি

ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং জটিল চরিত্র হলেন দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার কাছে নিয়ম-নীতি এবং শৃঙ্খলার কোনও মূল্য নেই। মূল্য আছে, শুধু তাঁর খামখেয়ালিপনার এবং অন্যান্য বিচিত্র কার্যকলাপের কাছে আত্মসমর্পণের।

তাঁর রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি কোনও সমস্যার গভীরে যেতে ইচ্ছুক নন। শুধু সস্তার রাজনীতিতে এবং চমকে বিশ্বাসী। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, চমকাইতলা। রিজওয়ানুর এবং হালে দমদম থানার তরুণ অফিসারের মৃত্যু নিয়ে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, এই দিককে নির্দেশ করে।

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন ইস্তক তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের সব থেকে উজ্জ্বল সময় হল বিজেপি তথা এন ডি এ সরকারে থাকাকালীন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁকে পুরস্কারস্বরূপ ভারত সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক রেলমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেননি। মাঝপথে সামান্য কারণে রেলমন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কারও অনুরোধ শোনেননি! এটা কি পরিণত মনের পরিচয় বহন করে? পরবর্তীকালে

তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, বুঝেছিলেন, উপযুক্ত প্লাটফর্ম না থাকলে, সঠিক দিশায় অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একটা সময় তিনি রাজনীতির মূলস্রোত থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। তখনও কিন্তু বিজেপি তার সঙ্গ ছেড়ে যায়নি। তার সঙ্গে সখ্যতা রেখে গেছে। আসলে তিনি তলে তলে মোটা ডালের খোঁজে ছিলেন। বিজেপি নেতাদের ল্যাজে খেলাচ্ছিলেন। হঠাৎ কোনও কৃতজ্ঞতা, সৌজন্যের তোয়াক্কা না করে তার এন ডি এ-র সঙ্গ ত্যাগ কোন সততা বহন করে, আমরা তা আজও বুঝতে পারিনি। অবশ্য তাঁর রাজনীতির স্টাইল সাধারণ মানুষের বোঝার ঊর্ধ্বে।

বর্তমানে দিদি সরকার গড়ার স্বপ্নে কংগ্রেসের ডালে ভর করে মগডালে ওঠার চেষ্টা করছেন। যে কংগ্রেস এবং সি পি এম এই কিছুদিন আগেও ভাই ভাই ছিল এবং মাননীয় দিদিকে উঠতে বসতে কংগ্রেসকে নিন্দে-মন্দ করতেন। আজকে তারা হয়ে গেল তাঁর কাছে পরম সুহৃদ। যদিও অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায়, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর এই সমতা নিতান্তই সাময়িক। কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, তার সঙ্গে কংগ্রেস দলের আসন রফা হল, তাতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে তার কি খুব লাভ হবে। হবে না। কারণ মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস হচ্ছে সেই দল যার অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকার ৩২ বছর ধরে মনের সুখে রাজ্যপাট চালাচ্ছে। আর স্বার্থ এবং প্রয়োজন ফুরলে তৃণমূলকে অন্ধকারের গহ্বরে নিক্ষেপ করতে তাদের এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না, তখন মাননীয়া দিদির কী গতি হবে? এখন বিভিন্ন জায়গায় বামবিরোধী যে ফলের ধারা দেখা যাচ্ছে তাতে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক কোনও কৃতিত্ব নেই। মানুষ প্রকৃত বিরোধী জোট চাইছে। কোনও ছদ্ম জোট নয়। সেখানে বিজেপির সঙ্গে পথ চললে দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষেত্রে তাঁর লাভই হতো। কিন্তু তিনি সেই পথ মাড়ালেন না। তাই সব দিক বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পটুয়া পাড়ার অগ্নিকন্যার রাজনীতি নিতান্তই সস্তা এবং সাময়িক।

সুশান্ত কুমার দে, কলকাতা-১০৩।

ভাষা দিবস

আ-মরি বাংলাভাষা 'উদ্‌যাপন সমিতি' দত্তপুকুর আয়োজিত ভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হল ১ নং প্লাটফর্ম সংলগ্ন রেল মাঠে, দত্তপুকুরে।

১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৯) ঢাকায় ও ১৯৬১-র ১৯ মে অসমে কাছারের শিলচরে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে যারা আত্মবলিদান করেছিলেন, তাদের বিদেহী আত্মার প্রতিশ্রদ্ধা জানাতেই এ অনুষ্ঠান। ঢাকার রফিক, সালাম, বরকত, জববারের মতো মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় উপরোক্ত বরাক উপত্যকায়ও আত্মদান করেছিল চন্ডী, কুমুদ, সুনীল, কমলা, কানাই, ধরণী, শচীন, সুকোমল, হিকেশ, সত্যেন, নীরেনদের মতো যুবকেরা যাদের কথা শোনা যায় খুব কম।

তবে এনিয়ে দেশত্যাগী অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, 'উদ্যোক্তাদের মুখ্য ব্যক্তিত্বরা ও বঙ্গের বিতাড়িত। এপাড়ে আশ্রিত। 'মাতৃভাষা-মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ' যেমন সত্য, তেমনি 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' এ কথাও। মাতৃভূমি কি মাতৃভাষার চেয়েও ওপরে নয়? জন্মমাটিতে থেকে এ দিনটা পালন তো ভাগ্যে জুটল না। মাতৃভাষার মর্যদা অক্ষুণ্ণ রাখতে এসব কর্মকান্ড খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু মাতৃভূমি থেকে বিতাড়নের প্রতিকার প্রতিবাদে পূর্বোক্তরা কতটা সরব? বিশেষত যাদের এদেশে নাগরিকত্ব এখনও অনিশ্চিত। মাতৃভূমি ত্যাগের মর্মজ্বালা যাদের নেই ও আছে, উভয়ের ভাবানুবেগ কি কখনও এক ও অভিন্ন হতে পারে? যদি থাকে মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম ও আত্মমর্যাদাবোধ? চৌদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি থেকে হিন্দুত্বের অপরাধে উৎখাত হয়ে কেন আশ্রিত হতে হল বিদেশ বিভূঁয়ে? পিতৃ-পিতামহের সমাধিতে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন উপেক্ষিত রেখে এই অনুষ্ঠান কি পূর্ণাঙ্গ?

যে বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পূর্বোক্ত বীর সন্তানরা আত্মবলি দিয়েছিল, আজ কি সে বৈশিষ্ট্য বহাল আছে বাংলাদেশে? চাপের মুখে সংখ্যালঘুদেরকে পুরুষানুক্রমিক ভাষা পাল্টে বলতে বাধ্য করা হচ্ছে আরবী, ফারসী শব্দ, যেমন নমস্কার নয় — সালাম আলাইকুম। এসব বুলি পাল্টানো আজ হার মানিয়েছে পাকিস্তান আমলকেও। যাতে উর্দুকে চাপিয়ে দেবার ইসলামি মৌলবাদী প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি ষোলআনা।

উল্লেখ্য, বিতাড়িত দেশত্যাগীরা 'মাতৃভূমি দিবস' পালনের উদ্যোগ নিলে এইসব খানদের পাত্তা মিলবে তো?

নির্মলচন্দ্র আইচ, শিবালয়, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণাঃ (উঃ)

পাকিস্তানে খেলা

ক্রিকেট খেলা ভদ্রলোকের খেলা। কিন্তু সেই খেলাকে নিয়ে যা চলছে তাতেমনে হয় এই বিশেষণ এই খেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানে টেস্টম্যাচের তৃতীয় দিন সকালে টিমবাসের উপর যেভাবে জঙ্গি আক্রমণ হল — বুলেট আর গ্রেনেড সহযোগে তা ক্রিকেট দুনিয়ায় ছিল কল্পনাতীত। পাকিস্তান বর্তমানে এক জঙ্গি রাষ্ট্র।

এই দেশ এর আগে বহুবার পশ্চিমী দুনিয়ার ব্যক্তিদের টার্গেট করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বহু বিদেশীও মারা গেছে। সম্প্রতি ২৬/১১ মুম্বাই আক্রমণ করেছিল যারা, তারা সকলেই পাকিস্তানের অধিবাসী বলে প্রমাণিত। সুতরাং পাকিস্তান বা পাকিস্তানীদের মনোভাবটাই হল ধ্বংসাত্মক।

আন্তর্জাতিক স্তরের খেলা হলে সেই খেলোয়াড়দের জন্য যে স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ তা ছিল না। কেন থাকবে না? তাহলে কি ঘটানো ঘটনাটা পূর্বপরিকল্পিত? নিয়ম হচ্ছে হোটেল থেকে দু'দেশের টিমবাসের একই সাথে যাত্রা করা উচিৎ। কিন্তু পাকিস্তানের টিমবাস ৫ মিনিট দেরি করে কেন বার হল? সেই সন্দেহটা কি জঙ্গিদের পক্ষেই যাচ্ছে না? সবথেকে বড় কথা হোটেল থেকে বাস ছাড়ার পর কোনও এক অজানা কারণে শ্রীলঙ্কার বাসটিকে নির্ধারিত রুটে না গিয়ে, অন্যরুট দিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ কে দিয়েছিল? একটা আন্তর্জাতিক খেলাতে এভাবে যদি নিরাপত্তায় গলদ থাকে এবং তাতে যদি খেলোয়াড়দের প্রাণ সংশয় ঘটে তাহলে সেই দেশে কোনও খেলা বিশ্বক্রীড়া সংস্থার করা উচিৎ নয়।

আরও আছে। শ্রীলঙ্কার ওই বাসটি বুলেট প্রুফ ছিল না। পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের মধ্যেও অশালীন ব্যবহার বহুবার পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাভেদ মিয়াদাদ, ইনজামাউল হক, শোয়েব আখতার। সুতরাং যে দেশে খেলোয়াড়দের কোনও নিরাপত্তা নেই, যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা জঙ্গি দমনে ব্যর্থ, যে দেশে জঙ্গি ও গুন্ডাতে ভর্তি সেই দেশে ঘাতে কোনওরূপ কোনও খেলা, খেলোয়াড় ও দেশ খেলতে না যায় তার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিৎ বিশ্ব ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থার। এবং আগামী কুড়ি বছর পাকিস্তানকে সকলদিক থেকে একঘরে করে রাখা উচিৎ। তা না করলে ভবিষ্যতে যে কোনও খেলোয়াড়ের প্রাণসংশয় হয়ে পড়বে। শ্রীলঙ্কার বুদ্ধিস্টদের বরাত জোরে তারা প্রাণে বেঁচে গিয়ে জঙ্গিরাষ্ট্র থেকে মুক্ত হয়ে পরিজনদের সাথে আবার মিলিত হতে পেরেছে।

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

ইসলামের বিধান সম্পর্কে হিন্দুদের অজ্ঞতা

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান যুগ স্পুটনিক, রকেট, কম্পিউটারের যুগ। অথচ এই যুগেও মুসলিম সমাজে কিছু মধ্যযুগীয় প্রথা বিদ্যমান। যেমন তিন তালাক প্রথা।

শাহবানু মামলার কথা আমরা অবশ্যই বিস্মৃত হইনি। শাহবানুর অপরাধ তিনি বিগত যৌবনা। তার মিঞাসাহেব তার নওজোয়ান শালিকার প্রতি আসক্ত। কিন্তু শরিয়তি আইন অনুসারে এক সাথে দুই সহোদরাকে স্ত্রী হিসেবে রাখা যায় না। তাই বিগত যৌবনা শাহবানুকে তালাক দেওয়া হল। বেচারি শাহবানু! নিরুপায় হয়ে সরকারের দ্বারস্থ। কিন্তু আমাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকার শরিয়তে হস্তক্ষেপ করতে অপারগ। তাই সংবিধান সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টের রায় রোধ করা হল। কলকাতার কনভেন্টে পড়া মেয়ে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, খাম্বাজ খান নামে এক কাবুলিওয়ালাকে শাদি করে আফগানিস্তানে শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়। তিনি সেখানে তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর নিজেরই লেখা উপন্যাস "কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ" -এ। মিঞা সাহেব সেখানে তার চার বিবি নিয়ে একই শয্যায় শয়ন করে। খানা পাকাতে একটু দেরী হলে বা অন্য কোনও তুচ্ছ কারণে পতিদেবতা তো বটেই দেবররাও বৌদিদের পেটাতে কসুর করে না। মুসলিম সমাজে শ্বশুর কর্তৃক ধর্ষিতা হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর এমনটা হলে অর্থাৎ শ্বশুর কর্তৃক ধর্ষিতা হলে, শরিয়তি আইন অনুযায়ী শ্বশুরকেই শাদি করে তাকেই স্বামী হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে — স্বামীকেই সন্তানবৎ প্রতিপালন করতে হয়। আরও আছে, কোনও মুসলিম রমণী ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্তা হলে, অথবা ধর্ষিতা হলে তাকেই চারজন পুরুষ সাক্ষী যোগাড় করতে হবে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে। এসব বিষয়ে চারজন পুরুষ সাক্ষী জোগাড় করা এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত রমণীকে পাথর ছুঁড়ে অথবা খাদ্য ও পানীয় না দিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখা হয়, যতক্ষণ না তার ইন্তেকাল হচ্ছে।

এত কিছু জানা সত্ত্বেও "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ" বোঝানো সত্ত্বেও হিন্দু তরুণীরা হিন্দু সমাজের খোলামেলা পরিবেশ পরিত্যাগ করে, কেন মুসলমানদের শাদি করে তাদের বিবি বনে যাচ্ছে তা রীতিমতো রহস্যজনক! কোটিপতির মেয়ে প্রিয়াঙ্কা টোডি কেন তাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছেড়ে রিজওয়ানুর রহমনের তিলজলা লেনের বস্তিতে এসে বাস করতে চায় বোঝা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র প্রিয়াঙ্কা টোডি নয়, বিত্তশালী হিন্দু চিত্রাভিনেত্রী, হিন্দু মডেল কন্যা, শিক্ষিতা সুন্দরী ব্যবহারজীবী, সাংবাদিক, অধ্যাপিকা, নৃত্যশিল্পীদের অনেকেই "আলোকোজ্জ্বল অগ্নিশিখার দিকে ধাবমান্ পতঙ্গের মতো" ছুটে চলেছে। ধর্মান্তরিতা হওয়ার পর এইসব তরুণীদের লোকসানের পালা শুরু হয়। এদের খাদ্যরুচি আহত হয় প্রতিদিন, স্বাধীনতা খর্ব হয় প্রতি পদে পদে, তালাকের ভয়ে তটস্থ থাকতেহয়। দু-চারজন ব্যতিক্রমী ছাড়া অধিকাংশই এক প্রবঞ্চ নাময় জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়, অথচ প্রকাশ করতে পারে না।

এলিট সোসইটির হিন্দু তরুণীরা যদি মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তরুণীদের নানাভাবে প্রলোভনের টোপ দিয়ে যে সহজেই বঁড়শিতে গেঁথে ফেলা যাবে সে তো স্বাভাবিক আর সেটাই ঘটে চলেছে নিয়মিতভাবে। কলকাতার কিছু নামি-দামি মেয়েদের স্কুল-কলেজের সামনে স্কুল-কলেজ শুরু হওয়ার সময় কিছু মুসলিম যুবক গাড়ি বা বাইক নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা থাকে এমন ২/১ জন মেয়েকে নিয়ে এরা চলে যায়। বাবা বা অভিভাবকরা জানতেও পারে না মেয়ে সারাদিন কোথায়, কি করে এল। এইভাবে কিছুদিন চলার পর মেয়েগুলি বাধ্য হয়, মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে, শাদি করতে। না হলে সব কিছু প্রকাশ করে দেওয়ার হুমকি। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন, মসজিদ কমিটি সাহায্য করে থাকে মুসলিম যুবকদের অর্থ দিয়ে বা অনান্যভাবে। উদ্দেশ্য যত পার হিন্দু নারী সংগ্রহ করে, তাদের ব্যবহার করে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা। "পয়দা করে ফয়দা উঠাও" খাজা নাজিমুদ্দীন-এর নির্দেশ কার্যকরী করার প্রচেষ্টা।

বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, নায়িকারা প্রায় সবাই হিন্দু হলেও, নায়করা প্রায় সবাই 'খান' সম্প্রদায়ভুক্ত। শাহরুখ খান, আমীর খান, সলমন খান, সঈদ আলি খানরা তো আছেই, এখন আবার নতুন নতুন নাম শোনা যাচ্ছে। ২/১ জন ছাড়া মুসলিম নায়িকা কিন্তু দেখা যায় না। যে দু'-একজন আছে তাদের কিন্তু কখনও অশালীন পোশাকে অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি করতে দেখা যায় না। আর হিন্দু নায়িকারা? অর্ধ উলঙ্গ বা প্রায় নগ্ন দেহে 'খান' জাদাদের সঙ্গে যত নর্তন-কুর্দন। কিছুদিন আগে শর্মিলা তনয়া সোহা আলি খানের বিকিনি পরিহিতা এক ছবি কোনও এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে দাদা সঈফ আলি খানের প্রচন্ড গোঁসা হয়েছিল। কিন্তু বিকিনি পরিহিতা হিন্দু নায়িকাদের দেখে তার কখনও গোঁসা হয় কিনা শোনা যায়নি। উল্টে তাদের সাথে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। তবে নায়িকা করিনা কাপুরকে বঁড়শিতে গাঁথতে পারলে ভবিষ্যতে করিনা কাপুরকে খোলামেলা শরীরে অভিনয় করতে দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

তা সত্ত্বেও হিন্দু তরুণীদের মুসলমানদের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ। সম্ভবত সিনেমা, থিয়েটার যাত্রা উপন্যাস সর্বত্রই মুসলমানদের বীর, সাহসী, উদার, পরোপকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যদিও বিষয়টা সম্পূর্ণ বিপরীত। যত খুনী, ডাকাত, চোর, পকেটমার, স্মাগর্লার, সন্ত্রাসী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার প্রায় ৯৯ শতাংশই মুসলমান। এখন দেখা যাক পবিত্র কুরান-এ নারীদের বিষয়ে কি বিধান রয়েছে।

(১) তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র (স্বরূপ)। অতএব তোমরা তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।

সুরা ২ আয়াত ২২৩

(২) পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ আল্লা-ই তাদের এক এক কে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে, পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে।

সুরা ৪, আয়াত ৩৪

(৩) স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর।

সুরা ৪ আয়াত ৩৪

(৪) তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজনের সাক্ষী নেবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লা-ই তাদের জন্য অন্য কোনও ব্যবস্থা করেন।

সুরা ৪, আয়াত ১৫

উল্লেখিত আয়াতগুলি উদ্ধৃত হয়েছে হরফ প্রকাশনীর মাওলানা মোবারক করীম জওহর কর্তৃক অনুবাদিত 'কুরান শরীফ' থেকে।

দেখা যাচ্ছে স্ত্রীলোকদের বিষয়ে ইসলামের বিধান কত উদার, কত মহিমান্বিত নয় কি? কি বলেন?

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান

পরিবেশ ভাবনা ও বন সংরক্ষণ

কমল ব্যানার্জী।। পরিবেশের সংজ্ঞা নির্ণয়ে প্রাচীন ভারতের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আধুনিক কালের চিন্তার বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। এ যুগে পরিবেশ বলতে বোঝানো হয়, লিথোস্ফীয়ার, হাইড্রোস্ফীয়ার, অ্যাটমস্ফীয়ার অর্থাৎ মাটি, জল ও বায়ুমণ্ডলকে। প্রাচীন ভারতে পরিবেশের উপাদানগুলি ছিল ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, তাপ বা শক্তি, বাতাস ও আকাশ বা পরিমণ্ডল। এই পাঁচটি উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলে তবেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে এমনই ধারণা ছিল প্রাচীন আর্য ঋষিদের। জীবন স্রোতকে বহমান রাখতে হলে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা একান্ত জরুরি। না হলে ঘটতে পারে সৃষ্টির চির-সমাধি। পরিবেশের এই পাঁচটি উপাদানের কথা পদ্ম পুরাণে (স্বর্গখণ্ড) পাওয়া যায়। জীবকুলের অস্তিত্বের জন্য পাঁচটি উপাদানের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় জীবন ধারার সঙ্গে বনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সে সময় প্রতিটি মানুষের জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হতো — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার শুদ্ধি এবং পাপস্খলনের জন্য সে সময় বনে গিয়ে জীবন অতিবাহিত করার বিধান ছিল। তাই সে যুগে বনকে বাঁচিয়ে রাখা সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ত।

পরিবেশকে নির্মল রাখতে এবং এর ভারসাম্য বজায় রাখতে যে গাছের বিশেষ ভূমিকা আছে, সে কথাও প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের জানা ছিল। তাই প্রাচীন ভারতে বন ও গাছের সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল আশ্রমিক। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো আশ্রমে থেকে। আশ্রমগুলোর বেশির ভাগই গড়ে উঠত বনে বা বন সংলগ্ন অঞ্চলে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবস্থাতেই বনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারত এবং গাছের প্রতি তাদের ভালবাসা জন্মাতো যা পরবর্তীকালে বনভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতো।

জীবন-চর্চার ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারতে নগর জীবনের সঙ্গে আরণ্যক জীবন সমান গুরুত্ব পেত। অরণ্যকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধু নগর কেন্দ্রিক জীবনের উন্নতি সাধন সে যুগের সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল। মূলত আর্য ঋষিদের আবাসস্থল হিসাবে বনভূমি চিহ্নিত হলেও, রাজা এবং রাজ পরিবারের লোকেরাও মাঝে মধ্যে বনে গিয়ে কিছুকালের জন্য আশ্রমিক জীবনযাপন করতেন। আমাদের দুটি মহাকাব্যেই এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে। শুধু রাজা বা রাজ পরিবারের লোকেরাই নয়, নগরে বসবাসকারী অন্যান্যরাও বনে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এর ফলে

নগরবাসী এবং বনবাসীদের মধ্যে যেমন সুসম্পর্ক গড়ে উঠত, তেমনি প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে বনসংরক্ষণের সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেত।

প্রাচীনকালে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের একটা বড় অংশ আসতো বনাঞ্চল থেকে। কৌটিল্যের মতে বন হচ্ছে সম্পদের উৎস। বায়ু পুরাণ এবং মৎস্যপুরাণ গ্রন্থ দুটিতেও পরোক্ষভাবে এর উল্লেখ আছে। তাই সে যুগের মানুষ শুধু পরিবেশের জন্যই নয়, সম্পদের উৎস হিসেবেও বনরাজিকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বদা চেষ্টা করত।

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ভেষজ ছিল অপরিহার্য। এইসব ভেষজ-উদ্ভিদ শুধু বনাঞ্চলেই নয়, বনের বাইরে লোকালয়েও পাওয়া যেত। এছাড়াও কৃষি পদ্ধতির প্রচলন হবার পর বেশ কিছু গাছ কৃষি-নির্ভর হয়ে পড়ে। এইসব গাছেরও সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই এইসব গাছকে পবিত্র গাছ নতুবা দেব-দেবীর প্রিয় গাছ আখ্যা দিয়ে পূজার অঙ্গ হিসেবে এদের ব্যবহার করা হতো। কিছু গাছ সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষ পূজারও প্রচলন ছিল সে যুগে। "বৃক্ষ পূজার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়", এই উক্তির মধ্য দিয়ে অগ্নিপুরাণে বৃক্ষ পূজার সমর্থন করা হয়েছে। এছাড়াও বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, নিম্ব, অশোক, কদম্ব, শ্লেষ্মাত্মক ও করঞ্জক — এই আটটি গাছকে কুল বৃক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে এদের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই গাছগুলোর অবদান আজও অনস্বীকার্য।

শুধু সংরক্ষণই নয়, বনাঞ্চল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও প্রাচীন পণ্ডিতদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই প্রাচীন ভারতে বৃক্ষরোপণ এবং কানন বা আরাম প্রতিষ্ঠা পুণ্যকর্ম বলে ঘোষিত হতো।

পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে গাছ এবং বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য এতসব রীতি-নীতির প্রচলন থাকা সত্ত্বেও, সে যুগের সমাজে লোভাতুরা মানুষ যে একেবারে ছিল না এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নানাভাবে গাছ ও বনাঞ্চলের ক্ষতি করত। এদের জন্য সে যুগের সমাজ ব্যবস্থায় কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। সামাজিক, শারীরিক ও আর্থিক-এই তিন ধরনের শাস্তি দেওয়ার প্রথা সে সময়ে চালু ছিল। যেমন, ধান চুরি করলে শাস্তি ছিল এক বছর প্রায়শ্চিত্ত করা (কর্ম পুরাণ / উত্তরভাগ), ওষধি গাছ ধ্বংস করলে অপরাধীকে পূজা ও যজ্ঞ করার শাস্তি দেওয়া হতো (অগ্নিপুরাণ), ফলবতী বৃক্ষ কাটলে অপরাধীকে মালিকের ক্ষতিপূরণ তো দিতে হতই, উপরন্তু আর্থিক জরিমানা রাজকোষে জমা দিতে হত (মৎস্য পুরাণ), বল্লী বা গুল্ম জাতীয় গাছ নষ্ট করলে অপরাধীকে এক স্বর্ণ মুদ্রা জরিমানা করার বিধান ছিল (মৎস্য পুরাণ), অশ্বত্থ গাছ কাটলে অপরাধী সমাজে ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হত (ব্রহ্মবৈধত পুরাণ / প্রকৃতি খণ্ড)। এ ধরনের আরও অনেক শাস্তির কথা বলা আছে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে।

শ্রীচৈতন্যর সন্ন্যাস গুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতী

ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর

একজন পরম গৌরবর্ণ যুবক পণ্ডিত বহুমানিত অধ্যাপক এসেছেন কাটোয়া শহরের প্রান্তে। সময় কাল আজ থেকে প্রায় পাঁচ শত বছর আগে, ১৪৩১ শকাব্দ (১৫১০ খ্রী) ২৯ মাঘ শনিবার পূর্ণিমার দিনে সংক্রান্তিতে। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সঙ্গী। আর একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁকে বোঝাতে শুরু করেছেন। ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রমে ভিড় করেছে জনগণ — আবাল বৃদ্ধ বণিতা। পরম গৌরবর্ণ মহান পণ্ডিতটি উক্ত সন্ন্যাসীকে কাকুতি-মিনতি করছেন, তাঁকে সন্ন্যাস দিতে বলছেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বারংবার নানা যুক্তি দিয়ে তাঁকে করতে চাইছেন সঙ্কল্পচ্যুত। কারণ যুবক পণ্ডিতটি সংসারে তাঁর বৃদ্ধা মা ও যুবতী সুন্দরী তরুণী ভার্য্যার একমাত্র অবলম্বন। ক্ষুব্ধ জনতা চায় না যুবকটি দীক্ষা নেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যুক্তি জাল বিস্তার করলে কি হবে, ওই যুবকের সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠতে পারছেন না। তাঁর মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দোলাচল বৃত্তি, মায়ের কোল থেকে তার প্রাণ সেঁচা ধনকে ছিনিয়ে নেবার জন্য তাঁকে দোষ দেবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — এই ভেবে তিনি আশঙ্কাগ্রস্ত।

তবে তিনি যুবককে আগেই দিয়েছিলেন সন্ন্যাস নেবার প্রতিশ্রুতি। আর সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সন্ন্যাস নেবার যুবশক্তির তীব্র আকুতি ও গুরুভক্তি। শেষ পর্যন্ত জিত হল ওই যুবকটির — তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা পেলেন। ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টি হল যুগান্তর। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অনেক ভেবে-চিন্তে যুবকটির সন্ন্যাস নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য', সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য বা চৈতন্য। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি হলেন শ্রীপাদ কেশব ভারতী।

লোচনদাসসহ বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজন ও পদকার কন্টক নগরের (কাটোয়া) জনগণের তথা বিশ্বের জনগণের শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস নেওয়ায় তাঁদের মনোবেদনার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীপাদ কেশব ভারতী শ্রী চৈতন্যের সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করার দীক্ষা গুরুই শুধু নন, তিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্যের অপ্রকট সহচর ও অভিভাবকতুল্য। অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণের দিন উপস্থিত ছিলেন শ্রী চৈতন্যের মেসো নবদ্বীপের শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্য পণ্ডিত, যিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্যের অন্যতম অভিভাবক।

১৪৫৮ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি কোনও এক সময়ে মন্তেশ্বর থানার দেনুড় গ্রামে কেশব ভারতী আবির্ভূত হন। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম কাশীনাথ আচার্য। আদি নিবাস নবদ্বীপের ঝুলিয়া গ্রাম।

তাঁর পিতা মুকুন্দ মুরারি ভট্টাচার্য। তাঁর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ বলভদ্র, কনিষ্ঠ রামভদ্র শৈশবে সংসার ত্যাগী হয়ে মহীশূরে আচার্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের দশনামী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ভারতী সম্প্রদায়ে দীক্ষা নেন — সন্ন্যাস নাম হয় শ্রীকেশব ভারতী। কবি কর্ণপূরের গৌর গণোদ্দশীদীপিকার মতে, তিনি পুরী সম্প্রদায়ের মাধবেন্দ্র পুরীর কাছেও দীক্ষা নেন। পরবর্তী কালের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে (২৩ বিলাস) এই কথাই আছে।

"বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল কালীনাথ আচার্য
ঝুলিয়াবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্য।
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস
কেশব ভারতী নাম জগতে প্রকাশ।।'

মাধবেন্দ্র পুরীর নেতৃত্বে বা প্রভাবে বেশ কিছু বাঙালি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করে বৈষ্ণব হন। কিন্তু তাঁরা শঙ্কর উপাধি ত্যাগ করেননি। যথা কেশব ভারতী।

কাটোয়া মহকুমার খাটুন্দি গ্রামে (খাটো নদীয়া) গড়ে উঠেছিল যোগ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। তাই বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করে কেশব ভারতী 'খাটুন্দিতে' এসে মঠ স্থাপন করে বাল গোপাল প্রতিষ্ঠা করেন। এতে বোঝা যায় তিনি ছিলেন বাৎসল্য রস প্রধান ভক্ত। তাঁর অগ্রজ বলভদ্রের দুই ছেলে মদন ও গোপাল ভারতীসহ অনেককেই কেশব ভারতী মন্ত্র দেন বৈষ্ণবীয় প্রথায়। কেশব যেহেতু সন্ন্যাসী ও বিবাহিত নন, খাটুন্দির ঊষাপতি ও নিশাপতি নামে দুই ব্রাহ্মণকে তিনি বৈষ্ণব মন্ত্র দেন।

এঁরাও তারপর শ্রী কেশবের সন্তান হিসাবে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে এঁদের ওপর তিনি খাটুন্দির সেবা-পূজার ভার দেন। পরিণত বয়েসে কাটোয়ার অজয় ও ভাগিরথী সঙ্গমস্থলে আশ্রম নির্মাণ করে সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রী চৈতন্য পূর্ব সময় থেকে ইন্দ্রানী মহাতীর্থের প্রাণকেন্দ্র কাটোয়া। এখানে গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণব সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। শ্রী কেশব ভারতীর প্রতি অন্তরঙ্গ আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন বলেই নিমাই ছুটে এসেছিলেন তাঁর কাছে।

তাঁর ছিল অসংখ্য অনুরাগী। জয়ানন্দের শ্রী চৈতন্য মঙ্গল অনুযায়ী ভারতী, গিরি, সরস্বতী, অরণ্য, তীর্থ, আনন্দ, অবধূত প্রভৃতি দশনামী সম্প্রদায়ের উপাধিধারী ভক্ত। উক্ত কাটোয়ার আশ্রমে যেখানে শ্রী চৈতন্য সন্ন্যাস নেন, সেখানে শ্রী কেশব ভারতী করতেন ধর্মতত্ত্ব আলোচনা ও সাধনভজন।

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ, ভক্ত ও অনুরাগীদের বিশ্বাস বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণর উপবীত দাতা সন্দিপনী মহামুনি (মতান্তরে অক্রুর) এবং প্রাচীন ভারতের ঋষি গর্গের মিলিত আধ্যাত্মিক শক্তির আধার — কেশব ভারতী। নিমাই -এর দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তাঁর মন্ত্রগুরু ঈশ্বরপুরীর মতোই সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর নবদ্বীপে যাতায়াত ছিল। শ্রীবাস অঙ্গনে নিমাই এবং কেশব ভারতীর সাক্ষাৎ হয়।

শ্রী চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের অন্যতম প্রধান কারণ নবদ্বীপের পাষন্ডী কুতার্কিক পড়ুয়াদের তাঁর প্রতি ব্যবহার, ঈর্ষা, তাদের অনমনীয়তা। তাছাড়া ভারতে তখন

(এরপর ১২ পাতায়)

সন্ন্যাসিনীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

প্রণব কন্যা সংঘ

ইন্দিরা রায়

এইবারের সংখ্যায় থাকছে প্রণব কন্যা সঙ্ঘ-র কথা। মধ্যমগ্রামের কোঁড়া চন্ডীগড় সাহেববাগানের বিস্তীর্ণ জমিতে মুক্ত পরিবেশে গড়ে ওঠা প্রণব কন্যা আশ্রমে উপস্থিত হলাম এখানকার বর্ত্মান সঙ্ঘজননী (সকলের বড় মামণি) সন্ন্যাসিনী পরমানন্দময়ী মা'র মুখোমুখি। আমাদের লেখার বিষয়ের উদ্দেশ্য তাঁকে জানালে তিনি প্রথমেই জানান, এই আশ্রম গড়ে ওঠার নেপথ্য ইতিহাস।

আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষের চিরন্তন-বাণী। এই ভাব নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে নিহিত থাকে। গার্গী মৈত্রেয়ীর মধ্যে গৌরীমা'র মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা ছিল, সেই আধ্যাত্মিকতা এখনও চলে আসছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সন্ন্যাসীদের আশ্রম। সেখানে পুরুষরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মেয়েদের সেক্ষেত্রে কোনও অধিকার নেই। শ্রীমদ্ প্রণবানন্দ মহারাজ চেয়েছিলেন মেয়েরা জাগুক, পথও খুঁজেও ছিলেন তিনি। কিন্তু ওনার সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবটা আসেনি। ১৯৬০-এ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে দীক্ষিত শিক্ষিত কয়েকজন মহিলা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইছিলেন। কিন্তু কীভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবেন, কোথায় থাকবেন, কী করবেন — বুঝতে পারছিলেন না। তৎকালীন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেক্রেটারি শ্রীমদ অদ্বৈতানন্দ মহারাজজীর শরণাপন্ন হন তাঁরা। ওই মহিলাদের আকুলতা-ব্যাকুলতা দেখে তিনি তাদের জমি বা বাড়ি দেখতে বললেন, যেখানে মেয়েদের আশ্রম গড়ে তোলা যায়। ১৯৬৮-র দুর্গা পুজোয় বেনারস ভারত সেবাশ্রমে সমস্ত সন্ন্যাসী ভক্ত-শিষ্যরা উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে যেসব মহিলারা শ্রীমদ্ অদ্বৈতানন্দ মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন সে কথা আলোচনার সময়ে উপস্থিত মহারাজের এক শিষ্যা পদ্মরাণী মিত্র জানান, তিনি মধ্যমগ্রামে কোঁড়া চন্ডীগড় সাহেববাগানে তাঁর জমির কিছুটা দান করবেন। কিছু দিন বাদে জমি দান করলেন। ছোট্ট একটা ঘর তৈরি হল। কিন্তু শহর কলকাতায় আসতে গেলে মধ্যমগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত দেড় মাইল কাঁচা কাদা-মাখা রাস্তা হাঁটতে হতো। কোনও যান ছিল না। সেখানে খাবার জলটুকুও পাওয়া যেত না। এই অবস্থা দেখে হৃদয়পুরের দুই ভদ্রলোক মাখনলাল দত্ত ও নারায়ণ সরকার স্টেশনের কাছে পড়ে থাকা দো'তলা

বাড়ির সন্ধান দিলেন। এখানে মেয়েরা কাজ শুরু করতে পারেন। গুরুজী বললেন — এত দূর গিয়ে মেয়েদের ক্লাস করা খুবই অসম্ভব। হৃদয়পুরে এই বাড়িটা নিয়ে আশ্রমের কাজ শুরু করা হোক। ১৯৭১-এর ২রা জানুয়ারি প্রণব কন্যা সঙ্ঘের জন্ম হয় হৃদয়পুরে। প্রথম সন্ন্যাসিনী হিসেবে যোগ দেন আগ্রহী পাঁচজন শিক্ষিতা ও স্বনির্ভর মহিলা। সমাজে মেয়েরা বড্ড বেশি অবহেলিত। ভারত সেবাশ্রমে স্বামীজীরা সারাদিন সেবামূলক কাজ

মধ্যমগ্রাম প্রণবকন্যা আশ্রমের চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির একটি দৃশ্য।

করেন, রাত্রে ধ্যান- জপ করেন— আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। এই নতুন সন্ন্যাসিনীরা আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকমের সেবামূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথম সঙ্ঘজননী ছিলেন সন্ন্যাসিনী সেবানন্দময়ী মা। কিছুদিন আগে ১১ ফেব্রুয়ারি উনি মর্তলোক ত্যাগ করেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট সন্ন্যাসিনী শুদ্ধানন্দনয়ী মা, ভাইস প্রেসিডেন্ট সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী মা, সেক্রেটারি সন্ন্যাসিনী অমৃতানন্দময়ী মা। সেবামূলক কাজ হিসেবে প্রথম শুরু হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় — ছেলে-মেয়ে উভয়কে নিয়ে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত। বিদ্যালয়ের জন্য আবাসিক শিক্ষিকা ছাড়াও বাইরে থেকে ৩ জন শিক্ষিকা আসেন। এরপর খোলা হয় বৃদ্ধাশ্রম। এখন আবাসিকার সংখ্যা এগারো। বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরাও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন বিভিন্ন কাজের সঙ্গে। অনাথ আশ্রমে ৬৮ জন আছেন, তার মধ্যে ৫৩ জন বনবাসী। এখানে যারা যত পড়াশোনা করতে চায়, ততদূর তাদের পড়ানো হয়। জনজাতিদের জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের জনজাতি ডিপার্টমেন্ট থেকে অর্থ আসে।

এছাড়া, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি আছে। মঙ্গল ও শনিবার সকাল ১০-১২টা আর বিকেল ৪-৬টা পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক, প্রতি সোমবার সকাল ১০-১২টা পর্যন্ত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা হয়। মাত্র ৩.০০ টাকা নেওয়া হয়, তার মধ্যে ওষুধের দামও থাকে। ডাক্তাররা আসেন আত্মনিবেদনের মন নিয়ে। প্রায় প্রতিদিনই ১০০/১৫০ জনের মতো আসেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, সামাজিক সমস্যায় এখানকার মেয়েরা শুধু পশ্চিমবঙ্গে তার বাইরেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সুনামির সময়ে আন্দামানে ওড়িশায় সাইক্লোনের সময়ে যাওয়া হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দী থেকেই মেয়েদের মধ্যে জাগরণ ঘটে বিরাটাকারে। মেয়েরা পুরুষের পাশে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া এখন সমাজের সকল ক্ষেত্রে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, এত সুযোগ, স্বাধীনতা, প্রলোভন ত্যাগ করেও শিক্ষিত স্ব-প্রতিষ্ঠিত মহিলারা আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে এসেছেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই সঙ্ঘ। শুধু তাই নয়, ১৯৭১-র পর এই সঙ্ঘের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলায়-হুগলির চুঁচুড়ায়, বাংলার বাইরে দিল্লী, বম্বে, পোর্ট ব্লেয়ার। মুখ্য অফিস হৃদয়পুর। সব শাখাতেই প্রায় এক ধরনের কাজ হয়।

মধ্যমগ্রামে ফুলের বাগান, সব্জি চাষ হয়। পাশাপাশি গরুও আছে, তা থেকে দুধ পাওয়া যায় যা আশ্রমের কাজে লাগে। এখানকার যাবতীয় কাজকর্ম আশ্রমের মহিলারাই করে থাকেন। শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনজন শিক্ষিকা বাইরে থেকে আসেন। এখানকার আবাসিক মেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজ শেখা বাধ্যতামূলক। দু'জন শিক্ষিকা আছেন নিটিং এমব্রয়ডারির আর টেলারিং এর জন্য। এক বছরের কোর্স কমপ্লিট করে সার্টিফিকেট পায়। এছাড়া গান-নাচ শেখানো হয় তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য। এখানে দুটি ক্রেস আছে। ২৫ জন করে আছে। ৩ থেকে ৪- বছরের মধ্যে রাখা হয়। এর জন্য কিছু নেওয়া হয় না। এটা সোস্যাল ওয়েল ফেয়ারের অধীনে।

এখানে নিয়মিতভাবে তিনবার পুজো হয়। নারীই শক্তি, তাই প্রণবকন্যা সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখায় মায়ের বিভিন্ন রূপের এক একটি রূপ পূজিত হয়। হৃদয়পুরে দুর্গাপুজো, মধ্যমগ্রামে কালীপুজো, চুঁচুড়া আন্দামানে বাসন্তী পুজো, ওড়িশায় জগদ্ধাত্রী পুজো হয়।

মাঘী পূর্ণিমা পালন সঙ্ঘের ও ভারত সেবাশ্রমের বিশেষ উৎসব। এদিনে শ্রীমদ্ প্রণবানন্দ মহারাজের আবির্ভাব তিথি, এ দিনেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়।

আশ্রমিক বাসিন্দা বা সেবিকা হতে হলে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার জানতে চাওয়ার উত্তরে মা জানালেন ঃ বয়স অবশ্যই পঁচিশ হতে হবে। অবিবাহিত হতে পারে। গ্রাজুয়েশন তো বটেই। পরিস্থিতি বুঝে স্কুল ফাইনাল পাশদেরও নেওয়া হয়। প্রথম সেবিকা হিসেবে লাল পাড় শাড়ি, সাদা জামা, পরে দু'বছর বাদে উড়নি পায়। পাঁচ বছর পর ব্রহ্মচারিণী হন। বারো বছর বাদে সন্ন্যাসিনী হন। আচার-আচরণ, পড়াশোনা-বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গীতা, চন্ডী পড়ার পর বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা দিতে হয়।

আধ্যাত্মিকতা ভেতরের জিনিস। শুধু জ্ঞান-ধ্যান করব, আশ্রমে থাকব বললে হয় না। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকা দরকার। জ্ঞানটা শুধু হলে হবে না, কিন্তু তাকে উপলব্ধি করারও প্রয়োজন। প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াবার মতো মনোবল থাকা প্রয়োজন। মানুষের সেবার জন্য পরিশ্রমী হতে হবে। যাঁরা আছেন তাঁরা এই মনোভাব নিয়ে এসেছেন। ব্রহ্মচারিণী জয়ন্তী জানালেন, ভারত সেবাশ্রমে খুব ছোট থেকেই যেতাম। দেশের কাজ সমাজের কাজ করার মানসিকতা ছোট থেকেই ছিল। গ্রাজুয়েশন করি ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে, বাংলায় এম এ করি। সাত-আট বছর চাকরি করার পর প্রণব কন্যা সঙ্ঘের কথা জানতে পেরে এখানে চলে আসি। প্রণব কন্যা সঙ্ঘর থেকে একটা পত্রিকা 'গায়ত্রী মাতা' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার উদ্বোধনের দিন ১৯৯৪-এ পুরোপুরি চলে আসি। এক বছর এখানে থাকার পর ওড়িশায় চলে যাই। আবার এখন এখানে। এখন এখানকার প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদে আসীন। সঙ্ঘের প্রধান জানালেন — একটা জিনিস লক্ষণীয়, এখন এ পথে আসার মতো মানসিকতা নেই। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা জাগছে না। ফলে যদিও বা যাঁরা আসেন, বেশি দিন স্থায়ী হন না।

শ্রীপাদ কেশব ভারতী

(১১ পাতার পর)

সন্ন্যাসীদের প্রতি বিরাট ভালবাসা শ্রদ্ধা। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের টিজিং এবং অত্যাচারেও ঈশ্বরপুরুষও বাহ্যিক প্রভাবান্বিত হন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাত্রি অতিবাহিত করেন সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর আশ্রমে। শ্রী চৈতন্য পরিবারদের সঙ্গে কেশব ভারতীও সেদিন মাতোয়ারা হন উদ্দাম নৃত্যে — কৃষ্ণপ্রেমে। তরুণ অনির্বচনীয় রূপের অধিকারী শিষ্যের পরম সাত্বিক শ্রীঅঙ্গের আলিঙ্গন স্পর্শে কেশব ভারতীর জীবনে খেলে গেল প্রেম রসের বিদুৎমালা।

শিষ্য শ্রী চৈতন্যও মহাভাবে সেদিন যেন হারিয়ে গেলেন নিজের মধ্যেই। 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'— বৃন্দাবন দাস (অন্ত্য১ম) বলছেন —

"পাক দিয়া দন্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি রোলি।।
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যার বস্ত্র সংবরে না শেষে।।"

অতঃপর কাটোয়ার ওই যুগনির্দিষ্ট মহান ঐশী লীলাভূমিতে সন্ন্যাস গুরু ও শিষ্যর মহান লীলা জগত করল প্রত্যক্ষ, কাটোয়াবাসী হল ধন্য।

কেশব ভারতীর আসল ভজনস্থল বর্তমানে গঙ্গা গর্ভে বিলীন, সম্ভবত ১৯৩৪ খ্রীঃ গঙ্গার প্রলয়ঙ্করী বন্যায়। ২৯ মাঘ, ১৪৩১ শকাব্দে ইন্দ্রেশ্বর ঘাট পার হয়ে বিকিহাট ও ঘোষহাটের পথ ধরে পন্ডিত নিমাই মিশ্র এসেছিলেন গোধূলি লগ্নে— কেশব ভারতীর আশ্রমে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাটোয়া থেকেই কেশব ভারতী শ্রী চৈতন্যের সঙ্গী হন;প্রথমে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে পরে নীলাচল বা পুরীতে। বৃন্দাবনদাস শ্রী চৈতন্য ভাগবতে বলছেন (অন্ত্য/ ১ম) —

"নিত্যানন্দ গঙ্গাধর মুকুন্দ সংহতি
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী।।"

নীলাচলে তাঁদের মধ্যে তত্ত্ব আলোচনা হত, কেশব ভারতী জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে ভক্তিমার্গকে শ্রী চৈতন্যের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করেন। তিনি শ্রী চৈতন্যের অপ্রকট পর্যন্ত সহচর ও অভিভাবক ছিলেন। সম্ভবত তিনি অপ্রকট হন শ্রী চৈতন্য অন্তর্ধানের পর, নীলাচলে বা বৃন্দাবনে।

শ্রী চৈতন্য ছিলেন লোকশিক্ষক। প্রেম দ্বারা তিনি সমাজের বহু শ্রেণীর লোকের মন জয় করে নেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে একত্রিত করে তিনি করেছিলেন কাজী বা শাসকদের বিরুদ্ধে অহিংসা আন্দোলন। তিনি প্রকৃত অর্থেই সমাজ বিপ্লবী। 'দশনানী সম্প্রদায়ের' ভারতী গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ তাঁদের মন জেতার হয় তো একটি কৌশল মাত্র। তাছাড়া কেশবভারতীও ছিলেন আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক উত্তালে উন্মত্ত ব্যক্তিত্ব।

প্রতি বছর মাঘী শুক্লা ভৌমী একাদশী তিথিতে দেনুড়ে কেশব ভারতীর আবির্ভাব তিথি পালিত হয়। কাটোয়া মহকুমার আউরিয়া গ্রামেও কেশবভারতীর স্মরণে বিশেষ উৎসব ও মেলা হয়। কেশব ভারতীর ভ্রাতুষ্পুত্র মদন ভারতীর বংশধরগণ এই মেলার প্রবর্তক। আর দেনুড় শ্রীপাট চালাচ্ছেন কেশব ভারতীর অপর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ব্রহ্মচারীর শাখারা। শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পাঁচ'শ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর সন্ন্যাস গুরু সুমহান কেশব ভারতীকে জানাই আমাদের আন্তরিক বিনম্র কোটি প্রণাম।

ওড়িশায় বিজেডি সাংসদ বিজেপি-তে

সংবাদদাতা ।। ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া কেন্দ্রের বিজেডি সাংসদ অর্চনা নায়েক গত ২০ মার্চ বিজেপি-তে যোগদান করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি-র সঙ্গে জোট ভেঙ্গে দিয়ে নবীন পট্টনায়েক ওড়িশার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁর অভিযোগ বিজেডি সেই জে এম এম-এর জোট বেঁধেছে যারা ওড়িশা ভাগের দাবি জানিয়েছিল। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও বিজেডি-তে তিনি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। নবীন পট্টনায়ককে তিনি 'মেরুদন্ডহীন ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, ওড়িশার রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই গত ১১ মার্চ নবীন পট্টনায়কের ধ্বনিভোটে আস্থা অর্জনকে অসাংবিধানিক বলে রিপোর্ট দিয়েছেন।

অর্চনা নায়েক

কলোরাডোয় ঋগ্বেদের শ্লোক

সংবাদদাতা ।। মার্কিন মুলুকের ডেনভারে কলোরাডো হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের প্রথম দিনটা শুরু হয় ঋগ্বেদের মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে। হিন্দু নেতা রাজেন জেড প্রথমে ঋগ্বেদ, তারপর উপনিষদ এবং ভগবদ্ গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করেন সুললিত কণ্ঠে। তারপর তিনি ইংরেজিতে সে সবের অনুবাদ করে শোনান। রাজেন জেড শুরুটা করেছিলেন 'ওম্' দিয়ে, শেষও করেছিলেন 'ওম্' ধ্বনি দিয়ে। খৃস্ট পূর্ব আনুমানিক দেড় হাজার বছর আগে ঋগ্বেদের শ্লোকগুলি তৈরি হয়েছিল যা এখনও পর্যন্ত বিশ্বের প্রাচীনতম। রাজেন বৃহদ আরণ্যক উপনিষদ থেকে পাঠ করে শোনালেন 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোঃ মা অমৃর্তংগময়'। শ্লোকটির অনুবাদ করলে দাঁড়ায় অজ্ঞানতা থেকে আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে চল, নিয়ে চলো অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমরত্বে। কলোরাডো রাজ্যের প্রতিনিধি সভার সদস্য সংখ্যা ৬৫। এই রাজ্যের প্রতিটি জেলার জনসংখ্যা গড়ে প্রায় ৭১ হাজার। কলোরাডোকে ভূস্বর্গ বলা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম রাজ্য কলোরাডোতে রয়েছে এক হাজারটিরও বেশি পাথুরে চূড়া, যেগুলির উচ্চতা ১০ হাজার ফুটের চেয়েও বেশি।

এই রাজ্যটিতে ৫৪টি বহুতল বাড়ি আছে যাদের উচ্চতা ১৪ হাজার ফুটের চেয়েও বেশি। দেশ-বিদেশের পর্যটকরা কলোরাডোতে আসেন এর সৌন্দর্য্যের টানে এবং স্কি করার জন্য। এমন চমৎকার ব্যবস্থা আর কোথাও নেই।

দলীয় মুখপত্রে ব্ল্যাক আউট

(৫ পাতার পর)

শুধু পি ডি এফ নয় — তৃণমূলের জোট সঙ্গী মজদুর ক্রান্তি পরিষদ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে আলাদা প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনী লড়াইতে যাচ্ছে। তাদের বক্তব্য, "তৃণমূল কংগ্রেস জোট সরকার গড়লেও দেশের উন্নতি হবে না।" তৃণমূল কংগ্রেস জোটের মধ্যে দ্বন্দ্বের চোরা স্রোত চলছে।

বামফ্রন্টের মধ্যেও প্রার্থী নিয়ে মত বিরোধ রয়েছে। আর এস পি-র সাংসদ জোয়াকিম বাক্সলা পার্টি থেকে পদত্যাগ করে মোর্চার প্রার্থী হতে চলেছে।

সিপিএম-এর প্রার্থী জ্যোতির্ময়ী সিকদারের পক্ষে নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে স্থানীয় সংগঠনকে নামানো যাচ্ছে না। সিপিএম-এর একাংশ জ্যোতির্ময়ী-এর বিরুদ্ধে ভোট করবেন। এখন এই ভোটটি জুলুবাবুর পক্ষে আসবে?

এ-রাজ্যে একমাত্র বিজেপি কোন্দলহীন ভাবে নির্বাচনী কাজে নেমে পড়েছে। আজ তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকলেও আগামী দিনে এরাই বর্ধিষ্ণু শক্তি।

লালু-রাবড়ির মন্দির

(৭ পাতার পর)

ও রাবড়ি দেবীর মধ্যে রাধার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই তিনি এই জায়গা দান করেন বলে জানিয়েছেন। রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের গরীব প্রীতির কথাও তুলে ধরেন তিনি। এতসবের পরেও ভক্তের আশা পূরণ হল না। সম্প্রতি রাজেন্দ্র যাদব ইলেকশন কমিশনারের কোপে পড়ছেন। আইন অমান্যের অভিযোগে পুলিশ রাজেন্দ্র যাদবকে গ্রেপ্তার করে। মন্দির তৈরির শেষ হওয়ার মুখে এই ঘটনায় বড় সড় ধাক্কা খেলেন লালু ভক্ত রাজেন্দ্র যাদব। ও তার মা মুখিয়া দেবী। সঙ্গে অবশ্য লালু রাবড়িও।

চিলেকোঠার সেপাই

(৩ পাতার পর)

দল বুদ্ধ বাবুর মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং দলের তিরস্কার সহ্য করে এ যাত্রা তিনি বেঁচে যান। পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপে সিপিএম দল আদর্শবাদীদের কাছে মর্যাদা হারাচ্ছে।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি আটকাতে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় সিপিএম। অন্যান্য দলকে সমর্থন প্রত্যাহারে প্ররোচিত করে এবং একশ দশ কোটির দেশকে বিপন্ন করে তোলে। অথচ কয়েক মাস যেতে না যেতেই ভোল পাল্টে ফেলেছে। বিগত ২৮ ডিসেম্বর বারাসাতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ বোর্ডের সিটু ইউনিয়ন উত্তর চব্বিশ পরগণায় পরমাণু শক্তিচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কয়েক মাসের ব্যবধানে তারা তাদের ঐতিহাসিক ভুলের পথ থেকে মনমোহনের পথে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। যে সি পি এম দল ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতায় ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিল তাদেরই এক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ বাবু ইন্দো-আমেরিকান চেম্বারস অব কমার্সের সভায় সর্বসমক্ষে বলেছেন যে "আমি আমেরিকায় যেতে পারলে খুশী হব। আমি আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানাই। এতে রাজ্যে শিল্পোন্নয়ণের গতি বৃদ্ধি পাবে। আমি আমেরিকায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি।" দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতেও পশ্চিমবাংলায় দলের অবস্থা কাহিল।

সিঙ্গুরে তাপসী মালিক হত্যাকাণ্ড থেকে নন্দীগ্রামে মহিলাদের নির্যাতন ও ধর্ষণে দল অভিযুক্ত। মন্ত্রী বীরসিং মাহাতো ধর্ষণ মামলায় দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। সাংসদ জ্যোতির্ময়ী শিকদারের স্বামীর সল্ট লেকের হোটেলে অবৈধ মধুচক্রের আসর ধরা পড়েছে। তাছাড়া মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে মাফিয়া ও অপরাধ জগতের সখ্যতা ও মাখামাখির খবর কারও কাছে অজানা নেই। সম্প্রতি নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের উপ-নির্বাচনে দল পরাজিত হয়েছে। আগামী দিন আরও ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে।

ত্রিপুরায় সি পি এম সরকার শ্রমিক-শিক্ষক-কৃষক ও কর্মচারী স্বার্থবিরোধী ভূমিকায়। সমস্ত অংশের মানুষ নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার। সীমাহীন দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে আচ্ছন্ন সিপিএম দল। নেতা মন্ত্রীদের দুর্নীতির পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে গেছে মার্কসের দল। সি পি এম পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলি দুর্নীতির পীঠস্থান। ব্লকগুলি দুর্নীতির পরিকল্পনা দপ্তর। রেগা, সর্বশিক্ষা ও মিড-ডে মিলের দুর্নীতির চোরাবলিতে হারিয়ে যাবার পথে সিপিএম। দলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে, দলিত বিরোধী এবং গরীব ও কৃষক বিরোধী কায়েমী স্বার্থবাদীরা দলে ব্যবসা করছে। দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে বন্ধ হয়েছে এপেক্স উইভার্স। ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলি প্রায় ভূমিকাহীন। সার কেলেঙ্কারির জেরে উদয়পুর গর্জি লোক্যাল কমিটির সম্পাদক শংকর দাস ছাঁটাই। ইতিপূর্বে নারী কেলেঙ্কারিতে ছাঁটাই হয়েছেন বিষ্ণু দত্ত। সালেমায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত শাসকদলের এল সি এস হরেন্দ্র দাস এখন দলীয় কমিশনের মোকাবিলায় ব্যস্ত। বিভাগীয় নেতার মদতে ও যোগসাজসে চলছে ফেন্সিডিল ও অন্যান্য নেশাদ্রব্যের রমরমা কারবার। অম্পি অঞ্চল কমিটির সম্পাদক শংকর কলই নারী কেলেঙ্কারিতে বহিষ্কৃত হয়েছেন। গণসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন অনৈতিক ও বেআইনি কাজে জড়িত। মুখ্যমন্ত্রী যখন স্কুল-কলেজে নীতিবোধ ও মূল্যবোধের বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন তার দলের নেতা-কর্মীরা দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে ব্যস্ত। চাকুরি নিয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ চলছে। রাজ্যে পাঁচ লক্ষাধিক বেকার। উদয়পুরের হরিজলা পঞ্চায়েতের দীপু ঘোষ রেগার অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত। শতাধিক পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সাসপেণ্ড হয়েছেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের কয়েকজনের হিসাব বহির্ভূত সম্পদ এবং বিলাসবহুল জীবন সংবাদপত্রের আলোচনার বিষয়। মামুন মিঞারা এই রাজ্যে সক্রিয় নেতা মন্ত্রীদের মদতে। পার্থ দাসেরা জাল সার্টিফিকেট দিয়েও বিধায়ক হয়ে যাচ্ছেন। দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির তালিকা সুদীর্ঘ। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল রহস্যজনক। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তার নির্বাচনী কেন্দ্র ধনপুরের মাঠে বলেছেন যে, সেখানকার জনগণ বিরোধী দলের প্রার্থীকে বেশি ভোট দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার জয় প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন। তদুপরি আগরতলা রবীন্দ্র ভবনে দলীয় উনিশতম সম্মেলনে প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টের পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে যে "এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, গণসংগঠনগুলির মোট সভ্য সংখ্যার আনুমানিক এক চতুর্থাংশের ভোট বামফ্রন্ট পায়নি।" মুখ্যমন্ত্রীর কবুল করা বক্তব্য এবং পার্টির দলিলের প্রেক্ষাপটে এবারের বিধানসভা জয়ের বিষয়ে জনমনে সন্দেহ গভীরতর হয়েছে।

প্রকাশ কারাত যখন তৃতীয় বিকল্প সামনে নিয়ে পুনরায় জনগণকে ধোঁকা দেবার প্রয়াসে ব্যস্ত, তখনই কেরলে দলের দুই মহারথী মহারণে জড়িয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। অন্যদের দুর্নীতি নিয়ে যে সিপিএম দল সর্বদা সরব, এখন তারাই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়ে বেকায়দায়। সাধারণ সম্পাদক পিনারাই বিজয়ন এবং মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দনের মধ্যে এই লড়াই নতুন কিছু নয়। তাদেরকে সামাল দিতে না পেরে ২০০৭ সালে সিপিএম দু'জনকেই পলিটব্যুরো থেকে সাসপেণ্ড করে। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। এখন অবস্থা আরও বেসামাল। দুই বামনেতার লড়াই এমন পর্যায়ে গেছে যে, জাতীয় রাজনীতিতে সিপিএম কোণঠাসা। ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করায় সিপিএমের শনির দশা শুরু হয়েছে। বিজয়ন ও অচ্যুতানন্দন লড়াইয়ের ফলে শনির সঙ্গে সঙ্গে রাহুর দশাও পরিলক্ষিত। কারাতের মুখে আবার চুনকালি। একবার মুখ পুড়েছে সোমনাথকে নিয়ে। সোমনাথ খুব ভাল করে কারাতের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছেন। এবারে আগুন লেগেছে কেরালে আপন ঘরে। যত ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে, তত বেড়ে যাচ্ছে আগুন। এই আগুন আস্ত ঘর পুড়িয়ে তবে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে। ই কে নায়নার মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎমন্ত্রী থাকাকালীন বিজয়ন কেরলের তিনটি জল বিদ্যুৎকেন্দ্র সারাইয়ের জন্য দেশীয় সংস্থা ভেলের চেয়ে তিনগুণ দরে কানাডার সংস্থা এ এন সি লাভলিনকে বরাত দেন। অভিযোগ উঠেছে যে, বিজয়ন এই কাজে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে বিরাট অঙ্কের ঘুষ আদায় করেছেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে যান। কিন্তু এখন আদালতের নির্দেশে ৩৭৪ কোটি টাকার দুর্নীতির বিষয়টি সিবিআই-কে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। একাউন্টেন্ট জেনারেলের মাধ্যমে রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই সি বি আই তদন্ত শুরু করবে। মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন সাফ বলে দিয়েছেন যে, তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আদালতকে অবমাননা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বিজয়নের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হচ্ছে কেরল হাইকোর্টের নির্দেশে। এদিকে বিজয়ন মুখ্যমন্ত্রীকে রাজনৈতিক দিক থেকে কাবু করার জন্য বিজেপি-র রথযাত্রার ন্যায় নব কেরল যাত্রার সূচনা করেছেন। সিপিএম পলিটব্যুরো বিজয়নকে সমর্থন করে দুর্নীতির পথে গিয়ে এই অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অচ্যুতানন্দন প্রবল চাপ সত্ত্বেও, নব কেরল যাত্রায় সামিল হননি। দুই পক্ষের মধ্যে আপাতত যুদ্ধ বিরতি দেখা গেলেও বৃহৎ সংঘর্ষ ঘনিয়ে আসছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। দক্ষিণ প্রান্তের সমুদ্রতট কেরলে সিপিএম দলে সুনামি ঝড় শুরু হয়েছে। এই ঝড়ো হাওয়া পশ্চিমবাংলা হয়ে ত্রিপুরায় আছড়ে পড়বে বলে আবহাওয়া দপ্তর থেকে লাল সংকেত জারি হয়েছে। ঘোলাজলের মৎস্যজীবীরা সাবধান। *(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)*

শব্দরূপ - ৫০২

বৈধরভি দত্তগুপ্ত

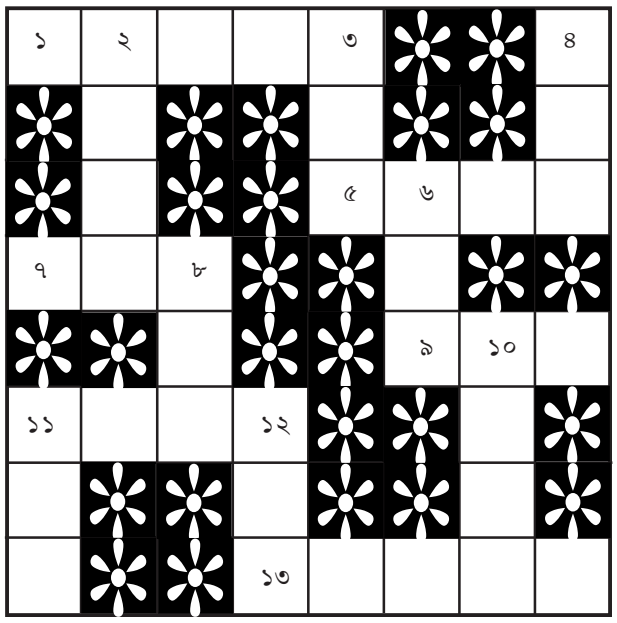

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন-এর একটি বিখ্যাত ছায়াছবি, প্রথম দুয়ে অভিসম্পাত, দুয়ে-চারে-পাঁচে পচা, ৫. যম রাজের কর্মচারী সর্বজীবের আয়ু ও পাপ-পুণ্যের হিসাবরক্ষক , ৭. এক ধরনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশেষ হুঁশ, ৯. রাজা যযাতির পিতা, ১১. বিশেষণে নিবারিত, সংযত, দুয়ে-চারে বিবিধ, ১৩. বেদব্যাস রচিত কুরুপাণ্ডব কাহিনি সংবলিত মহাকাব্য।

উপর-নীচ ঃ ২. অন্য নামে লক্ষ্মীদেবী, এক তিনে মুহূর্ত, ৩. ইন্দ্রের হাতে নিহত অসুর বিশেষ, ৪. নিষ্পন্ন, মধ্যে জননী, আগাগোড়া সাতসংখ্যা, ৬. ভয়, ত্রাস, শেষ দুয়ে বছর, ৮. লক্ষ্মীর আঞ্চলিক কোমলরূপ, ১০. সিংহনাদ, গর্জন, ১১. হিরণ্যকশিপুর পুত্র, ১২. বিশেষণে সমগ্র, সমস্ত।

সমাধান শব্দরূপ ৪৯৯

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম।
দেবলীনা গাঙ্গুলী
হাওড়া-৪

মে	■	■	না	মা	ব	লি	■
ন	■	■	ছো	■	ল্ল	■	■
কা	ঠ	খ	ড়	■	ব	ল	ভি
■	ন	■	■	■	■	ব	■
■	ঠ	■	■	■	■	কু	■
ব	নে	দি	■	প	রা	শ	র
■	■	দি	■	শ	■	■	য়া
■	ঝ	মা	ঝ	ম	■	■	নী

সমাধান শব্দরূপ ৫০০

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুণ্ডু
কলকাতা-৬

■	■	ক	ল্ল	ত	রু	■	ক
ক	ম	লা	■	■	ধি	■	ম
■	হা	■	ল	■	র	সা	ল
■	ভা	র্গ	ব	■	■	রা	■
■	র	■	■	বা	স	ব	■
শ	ত	ক	■	য়ু	■	ছ	■
ঙ্ক	■	ঙ্ক	■	■	অ	র	ণি
র	■	ন	ট	রা	জ	■	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যায়।

‘পাকদণ্ডী’র সংলাপে প্রতি মুহূর্তে বাস্তবের ছোঁয়া

দীপেন ভাদুড়ী

উপস্থাপনায় মন্ত্রোচ্চারণে নাটকের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যাবস্থায় কত সহজে অভাব-অনটনের যুদ্ধে পরাজিত মেয়েদেরকে বিপথে চালিত করা যায়। সেকথা এই নাটকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার, সঙ্গীত পরিচালক, অভিনেতা সঞ্জীব নস্কর। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ’০৯ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় গিরিশ মঞ্চে “অক্ষৌহিণী” নাট্যগোষ্ঠী “পাকদন্ডী” নাটকটি পরিবেশন করল। নাটকটি পূর্বে ১৫ তম সন্ধ্যা সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শন করার পর ১৬তম সন্ধ্যাটি প্রদর্শিত হল গিরিশ মঞ্চে ।

পরিচালকের কথায় এ সময়ের প্রেম রাবীন্দ্রিক না পাশ্চাত্যমুখী? সে যাই হোক, আমাদের প্রেম একুশের সাথে — নষ্টালজিয়া এ সময়ের প্রেম।

সংলাপে বাস্তবের ছোঁয়া প্রতি মুহূর্তে পাওয়া যায়। যেমন — এই যে শাড়ির আঁচল দিয়ে তোমার শরীরটা ঢেকে রেখেছো। আঁচলটা কোমরে বাঁধতে হবে। তবেই না লোকে তোমাকে দেখবে। আর লোক যতই তোমাকে দেখবে ততই তোমার প্রমোশন হবে। আবার দেবীর বাবার সংলাপে পাই — দেখো আকাশ, মদ খাওয়াটা আমার কাছে কোনও অপরাধ নয়। কিন্তু খেয়ে নোংরামো কারাটাই অপরাধ। মদ খাওয়াটা এখন একটা স্ট্যাটাসে পরিণত হয়েছে। তবে মাঝে-মধ্যে খাওয়াই ভালো।

ভালোবাসা মানুষকে বিপথ থেকে আবার সৎপথে উত্তরণে সাহায্য করে। এই চির শাশ্বত বাণীটি নাট্যকার তাঁর নাটকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। নাটকে দেবী আক্ষেপ করে বলেছে তার প্রেমিক আকাশকে — তুমি আমার স্বপ্ন। বাবা আমার বাস্তব। বাস্তব বড় কঠিন। আবার তার উপলব্ধির কথা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেনি তার সংলাপে। যেমন — আমি স্বপ্ন দেখতে চাই না — আমি চাই তোমার ভালোবাসা। আবার নাটকে তার বাবা অভিমন্যুর আক্ষেপ ভেসে আসে — মানুষের মানে — চাই গোটা মানুষের মানে — রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত গোটা মানুষের মানে।

নাট্যকার সুন্দর একটি চরিত্র উপস্থাপনা করেছেন তাঁর এই নাটকে। সেই চরিত্রটি একটি বোবার চরিত্র। অভিনয় করেছেন শেখর হীরা। প্রতি মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি দর্শককে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তিনি সহজে মঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য মঞ্চে অভিনয় করতে আসেননি।

আকাশ চরিত্রে সঞ্জীব নস্করের প্রাণবন্ত অভিনয় “পাকদন্ডী” নাটকের সম্পদ। দেবীর চরিত্রে সুনীতা চিত্রকর, অভিমন্যুর চরিত্রে তুহিন সাহা, পাপিয়া চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শকের ভালো লাগবে। ছোট্ট মেয়ে ডোনা গাঙ্গুলীর অভিনয় মনে দাগ কাটে।

নাটকটি উপস্থাপনায় নতুন আঙ্গিকের ছোঁয়া রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে পরিচালকের মুন্সীয়ানা প্রকাশ পেয়েছ এই নাটকটিতে। আলো বাবলু বিশ্বাস, আবহ সন্দীপ দে যথাযথ। সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকটি ধীরে ধীরে শততম রজনীর পথে এগিয়ে যাবে এ বিষয়ে প্রতিবেদকের সঙ্গে একমত দর্শকবৃন্দ।

‘পাকদণ্ডী’ নাটকের একটি দৃশ্য।

পারিবারিক মিলন সম্পর্ক প্রসারের সহায়ক

দীপেন ভাদুড়ী ।। গত ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পারিবারিক মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। গঙ্গার তীরে ফুলেশ্বরে এই মিলন উৎসবের পরে সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে অতি দক্ষিণ কলকাতা শাখার সদস্যবৃন্দ। অশোক মুখার্জীর পরিচালনার গুণে সমবেত সঙ্গীতটি সকলের মন জয় করে নেয়।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পক্ষে বিশ্বনাথ বিশ্বাস এই প্রতিবেদককে জানালেন — বছরে অন্তত একদিন পরিবারের সকলকে নিয়ে বনভোজনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের আয়োজন করে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম। বিভিন্ন পরিবারের ভিতর প্রীতির প্রসার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করতে এ ধরনের উৎসবের প্রয়োজন আছে। সর্বোপরি মানসিক সদভাবনার প্রসার ঘটায় এ ধরনের মিলন উৎসব।

সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতা রায়, বন্দনা চক্রবর্তী, তপতি মুখার্জী, রীতা সেনগুপ্ত প্রমুখ। শিবপুর শাখার তনুশ্রী মল্লিক এবং চন্দনা বসু বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন। সকলের অনুরোধে এই প্রতিবেদক বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দুটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কল্যাণ আশ্রমের অতি দক্ষিণ কলকাতা শাখা, সল্টলেক পশ্চিম শাখা, সল্টলেক পূর্ব শাখা, শিবপুর শাখা, কৃষ্ণপুর শাখা, মানিকতলা শাখা, গড়িয়া শাখা, টালিগঞ্জ শাখা প্রভৃতি এই মিলন উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

ফিরে দেখা

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবেদন

❊বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে ১৯৪৫-৪৬ সালে অখণ্ড ভারতে শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের ফলাফলেই ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। শতকরা ৯৭ জন মুসলমান ভারত ভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দেয়। এবং ছয় মাসের মধ্যে অগণিত হিন্দু হত্যা, হিন্দু নারী অপহরণ, ইজ্জতহানি ও হিন্দু সম্পত্তি লুণ্ঠনের মাধ্যমে পাকিস্তান হাসিল করে নেয়।

সেই নির্বাচনের প্রাক্কালে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সারা দেশে হিন্দুদের অসহায় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হিন্দু মহাসভার প্রার্থীদের ভোট দানের জন্য হিন্দু ভোটারদের কাছে আবেদন জানান।

স্বাধীন ও খণ্ডিত ভারতেও যে হিন্দুদের অসহায় অবস্থার তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি, তা বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকেই বোঝা যায়। সে প্রেক্ষিতে ডঃ মুখার্জীর বক্তব্য ৬৪ বছর পরেও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি বলে সম্পূর্ণ পত্রখানি পুনর্মুদ্রিত করা গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আবেদন পত্রে উল্লেখিত হিন্দু মহাসভা প্রার্থী প্রয়াত মনোরঞ্জন চৌধুরী ছিলেন নোয়াখালি জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) লামচর গ্রামের অধিবাসী এবং একজন নির্যাতিত রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবক। সাহিত্যসেবীও বটে। আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ডঃ মুখার্জীর বক্তব্য সময়োচিত এবং নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত বিজেপি প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারের পটভূমিকায়।❊

— সঃ স্বঃ

বন্ধুরেষু,

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে হিন্দু মহাসভার মনোনীত প্রার্থীকে আপনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবেন, এই অনুরোধ লইয়া আজ আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। হিন্দু মহাসভা কেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমার ও হিন্দু সভার অনান্য নেতার বিবৃতি হইতে আপনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন। ভারতের প্রায় সর্বত্র যে সকল আইনসভা ও শাসনযন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলি যে হিন্দুদের স্বত্ব ও অধিকার ধ্বংস করিবার জন্য নিয়োজিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের রাজনৈতিক অধিকার নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সৃষ্টি, উহাকেই ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান আইন সভাগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত যে কেবল হিন্দুদিগকেই বিপন্ন করিয়াছে তাহা নহে;ইহা ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয়তার পথেও সঙ্কট উপস্থিত করিয়াছে। এই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে আইনসভায় এমন লোক নির্বাচিত করিয়া পাঠাইতে হইবে যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিবে না, অপরের অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া হিন্দু জাতির নায্য অধিকার রক্ষার জন্য এবং সেই সঙ্গে ভারতের অখণ্ডত্ব ও স্বাধীনতার জন্যও সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাকিবে। হিন্দুরা অতীতে এই প্রকারের লোককে নির্বাচিত না করায় মারাত্মক কুফল ফলিয়াছে। আমরা আবার সেই ভুল করিলে, ভবিষ্যতে হিন্দু জাতিকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার কোনও উপায় থাকিবে না।

দেশের সম্মুখে এখন যে সকল গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত, ভারতব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব তাহাদের অন্যতম। যে যে প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা কম, সেই সেই প্রদেশ (অর্থাৎ বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এই ব্যাপারের কুফল সর্বাপেক্ষা বেশি ভোগ করিবে। কিন্তু ভারতব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, কেবল যে ঐ প্রদেশগুলিই ফলভোগ করিবে তাহা নহে;উহা দ্বারা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা এবং অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইবে। ভারতব্যবচ্ছেদ বিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের যে সম্মতি আছে, ক্রীপস্ প্রস্তাব দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ ও ভারতের পাঁচটি প্রদেশ (বঙ্গ-আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ) ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। কংগ্রেস বর্ত্তমানে বক্তৃতা দ্বারা পাকিস্থানের নিন্দা করিলেও কোনও প্রদেশ কিম্বা প্রদেশাংশের ''আত্মনিয়ন্ত্রণের'' অজুহাতে ভারত ব্যবচ্ছেদের নীতি মানিয়া লইয়াছে (বিগত পুণা অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ

ক্রীপ্‌স প্রস্তাব, মুসলিম লীগ প্রস্তাব এবং কংগ্রেস প্রস্তাব — এই তিনটির মধ্যেই ভারতব্যবচ্ছেদের কথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, যদিও কি প্রকারে, কোন্ অঞ্চলে ব্যবচ্ছেদ হইবে, তাহা লইয়া ইহাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আজ প্রশ্ন এই নয় যে কংগ্রেস কতখানি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছে;"ভারত ছাড়" কিম্বা "এশিয়া ছাড়" এই ধ্বনিগুলিও প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রধান প্রশ্ন এই যে — ভারত একটা অখণ্ড দেশ থাকিবে কিনা, এবং হিন্দুদের সভ্যতা, ধর্ম, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার এদেশে সুরক্ষিত থাকিবে কিনা। সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র হিন্দু মহাসভাই অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা চাহে। প্রকৃত গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল নরনারীর সমানাধিকার — হিন্দু মহাসভা এই সমস্ত নীতি পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদিগকেই "সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান" বলিয়া নিন্দা করা হয়। হিন্দু জাতির স্বত্ব ও স্বাধীনতার উপর যে সকল আক্রমণ হইতেছে সর্বপ্রকার উপায়ে তাহার প্রতিরোধের জন্য হিন্দুদিগকে একতাবদ্ধ হইতে বলিলে কোন অপরাধ হয়, ইহা আমরা মনে করি না। আমরা হিন্দুর জন্য এমন কিছু চাহিতেছিনা, যাহা অপরকে দিতে আমরা প্রস্তুত নই। আমরা বিশ্বাস করি না যে হিন্দু জাতির চিতাভস্মের উপর ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ নির্মিত হইতে পারে। আমাদের মাতৃভূমির একত্ব ও অখণ্ডত্ব ভাঙ্গিয়া দিয়া কাহারও সহিত কোন সন্ধি করিবার কোন প্রতিষ্ঠানের দলের বা ব্যক্তির আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

হিন্দু মহাসভা বহু প্রবল বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্যে নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে ব্যাপক প্রচার, দলসংগঠন ইত্যাদি কার্য্যের জন্য প্রচুর আয়োজন আবশ্যক। কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্বল সঙ্গতি আমাদের অপেক্ষা বেশি। সেইজন্য আমি আপনার নিকট এই ব্যক্তিগত আবেদন প্রেরণ করিলাম। হিন্দুজাতির স্বার্থ-সম্মান রক্ষার ভার যেমন হিন্দু মহাসভার উপর, তেমনি আপনার উপর ন্যস্ত আছে। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটকালে আমরা উভয়ে একত্রে কাজ করিলে, হিন্দুর জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতাও অর্জন করিতে পারিব।

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি,
অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা
৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা,
২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫

সৌরশক্তি ব্যবহৃত লাইট বাজারে আনলো ম্যাপল সোলার এনার্জি লিমিটেড

দীপক গাঙ্গুলী ।। বৈদ্যুতিক শক্তির সীমাবদ্ধ তার দিকে লক্ষ্য রেখে সৌরশক্তি ব্যবহৃত লাইট বাজারে আনলো ম্যাপল সোলার এনার্জি লিমিটেড। সংস্থার কর্ণধার কাজলকৃষ্ণ ভৌমিকের বক্তব্য অনুসারে স্বল্পমূল্যের এই সৌরশক্তি ব্যবহৃত বাতি বা সোলার এনার্জি লাইট সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয়তা এমনকী অর্থনৈতিক সামর্থ্যের দিকেও লক্ষ্য রেখে বাজারে আনা হয়েছে। সরাসরি সূর্যের আলো থেকে রিচার্জ করিয়ে এই লাইট জ্বালানো যাবে।

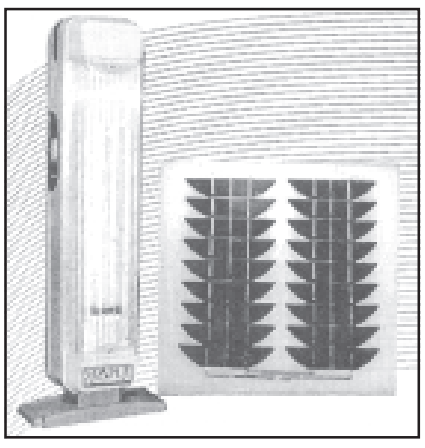

এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল, প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছয়নি সেখানে অত্যাবশ্যক হিসাবে যেমন ব্যবহার করা যাবে তেমনি শহরাঞ্চলেও এমারজেন্সি বা আপৎকালীন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এর মূল্য তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম। তার উপর মাত্র একবারই এর জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে অর্থাৎ রিচার্জের জন্য কোনও বিদ্যুৎ খরচ যে নেই তা এক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গত বিশ্বজুড়ে আজ বাড়ছে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক তা বর্তমানে ঘন ঘন লোডশেডিং-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়তই অনুভব করছেন। এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাকৃতিক শক্তিকে আধুনিক জীবনযাত্রায় সুষ্ঠুভাবে উপযোগী করে তুলতে তথা শক্তি সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের দিকে চিন্তা করেই এই উদ্যোগ। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে ম্যাপল সোলার এনার্জির এই উদ্যোগ সর্ব অর্থেই আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির নির্দেশক হিসাবে স্থান করে নেবে বলে শ্রী ভৌমিক জানান।

Swastika
30 March - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

তৃতীয় ফ্রন্টের গান-গাল-গপ্পো

এন সি দে।। আবার জাতীয় স্তরে নির্বাচন এসে গেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধান্দাবাজ বামপন্থীরা বাজারে নেমে পড়েছে — পড়ন্ত বেলায় বাতিল পড়ে থাকা ভোজ্যদ্রব্য কুড়োতে। জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বহীন বাতিলদের একজোট করে তাদের নিয়ে গড়ে তুলেছে একটি গোষ্ঠী — নাম দিয়েছে তৃতীয় ফ্রন্ট। প্রথম থেকেই তৃতীয় সেজে বসে আছে। যদি ভোগে লাগে প্রথম অথবা দ্বিতীয়দের। যেমনটি বসে থাকে নিষিদ্ধ পল্লীতে অলি-গলির রকে রকে সেজে গুজে ভোগ্যপণ্য হওয়ার লালসায়।

ওড়িশার কন্ধমালে হিন্দু নিধনকারীদের পাশে দাঁড়ানো বিজু জনতাদলের ঔদ্ধত্য ক্রমশ বাড়ছিল। বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই বিজেডি-কে এই নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিছু লোকসভা আসন পাওয়ার জন্য হিন্দুত্বকে প্রত্যাখ্যান করে নবীন পট্টনায়কের উদ্ধত বিজেডি-কে আঁকড়ে ধরেনি বিজেপি। কিন্তু ঘুঁটে পোড়ে, গোবর যেমন হাঁসে, তেমনি ঘুঁটে কুড়ানির দল সি পি এম ছুটেছে ওড়িশায় নবীন পট্টনায়কের বিজেডি-কে কুড়োতে। নবীনও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ওড়িশাকে শিল্পোন্নত করার পথে প্রধান বিরোধী সি পি আই-সি পি এম এবং ওড়িশাকে ভাগ করতে উদ্যত ঝাড়খন্ডীদের সঙ্গেও এখন হাত মিলিয়েছে। নবীনের ক্ষমতা তো টিকে গেছে। এবার শুরু হবে ২২ কারাটের ভেজাল সোনা প্রকাশ কারাত এবং খুনের ও ঘুষের কেসের আসামী ঝাড়খন্ডী নেতার হারের খেলা। শোনা যাচ্ছে নবীনের কাঁচা মাথায় ছায়া পড়েছে এক প্রবীণ আমলার। ইনি হলেন পিয়ারী মোহন মহাপাত্র। বাপের আমলের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। এখন শিঙ ভেঙ্গে ছেলের খিদমদগারি করছেন। শোনা যায় ইনি শুধু নবীনের কু-পরামর্শদাতাই নয়, তিনিই ছায়া মুখ্যমন্ত্রী। আপাত নিরীহ নবীনকে কমিউনিস্ট পাঁকে নামিয়েছেন এই বৃদ্ধই। নবীনকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খেলায় মাতিয়েছেন। যেমন মেতেছেন মায়াবতীও।

তৃতীয় ফ্রন্টের পুনর্জাগরণের সাথে সাথে টিভি চ্যানেল, খবরের কাগজগুলি শুরু করে দিয়েছে তৃতীয় ফ্রন্টের গান। সকাল-বিকেল টিভিতে দেখানো হচ্ছে তৃতীয় ফ্রন্টের হাত ধরাধরি ছবি আর আলেখ্য। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, দেবেগৌড়া, ইন্দ্রকুমার গুজরালের শাসনাধীন সময়কালকে তৃতীয় ফ্রন্টের সার্থকতা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু মিথ্যা কথা বলে কিছু মানুষকে কিছুকাল বোকা বানিয়ে রাখা যায়, সব মানুষকে চিরকাল বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। কথিত আছে, সাধারণ মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল, তাই তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে উপরোক্ত তিনজনই প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন বি জে পি বা কংগ্রেসের কৃপাতেই, যে দুটি পার্টিকে বামেরা প্রথম বা দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে বর্ণনা করছে। জঙ্গলে যেমন শৃগাল ও হায়ানার বাঘ-সিংহের শিকার করা পশু-মাংসের উচ্ছিষ্ট ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছিঁড়ে খায়; তথাকথিত তৃতীয় ফ্রন্টের নেতারাও তেমনি হ্যাং পার্লামেন্টের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে প্রথম হতে চায় না। এরা শুধু রামপ্রসাদের মতো কামনা করে "আমার মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মা, পাই যেন তায় খড় যোগাতে"। এই খুঁটি হয়ে কার পিছনে ঠেক্‌না দেবে আগে থাকতে এটাও তারা বোঝে না। কারণ ভোটের আগে যারা তৃতীয়, ভোটের পরেই তারা কেউ কেউ প্রথম দলে ভিড়ে যায় খুঁটি হয়ে। এই হল নীতিহীন তৃতীয় ফ্রন্ট, অচল অবস্থা কামনা, অচল অবস্থা সৃষ্টি করাই যাদের লক্ষ্য। টিভি, খবর কাগজওয়ালারাই এদের গান গেয়ে যাচ্ছে। এগুলো দেখলে বোঝাই যাবে না যে বিজেপি নামে কোনও দল ভোট যুদ্ধে নেমেছে। শুধু বিজেপি'র ঘরের কলহ দেখানোয় বোঝা যাচ্ছে বিজেপি বলে একটা নির্বাচনী দল আছে।

এবার আসি তৃতীয় ফ্রন্টের গাল-গপ্পে। ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলি এবার সব ফ্রন্টেই নিজ নিজ অঞ্চলে সিট ভাগাভাগি নিয়ে কামড়াকামড়ি বেশি করছে। কারণ তারা চাইছে সর্বভারতীয় বিজেপি বা কংগ্রেস দল যেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়। কেননা একক গরিষ্ঠতা পেলে তাদের নোংরা দড়ি টানাটানি বন্ধ হয়ে যাবে। তৃতীয় ফ্রন্টে থাকলেও দলগুলি তাদের নিজ নিজ এলাকাতে সিট ছাড়ছে না প্রায় কেউই। কেরলে সি পি এম সি পি আই-কে সীট না ছাড়ায় সি পি আই সব আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছিল। পরে নাকি সমঝোতা হয়েছে। দেবেগৌড়ার বর্তমান সাংসদ বীরেন্দ্র কুমার নির্বাচিত হয়েছিল কোজিকোড থেকে। এবার সি পি এম সীটটি দেবেগৌড়ার দলকে ছাড়েনি। স্বাভাবিক ভাবেই গন্ডগোল বেঁধেছে। মায়াবতী আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে যে উত্তরপ্রদেশে তৃতীয় ফ্রন্টকে কোনও সীট ছাড়বে না। তবে ভোটের পরে প্রথম / দ্বিতীয় গরিষ্ঠতা না পেলে ঘোলা জলে মাছ ধরতে তৃতীয় ফ্রন্টে যোগ দিতে তার আপত্তি নেই। সেই কারণে তার অঞ্চল থেকে সে বেশি সীট যোগাড় করে রাখতে চায় যাতে দর কষাকষিতে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য এগিয়ে থাকতে পারে। তবে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য লোভাতুর চোখে তাকিয়ে আছে আরো অনেকে। যেমন, শারদ পাওয়ার, দেবেগৌড়া, চন্দ্রবাবু নাইডু, লালুবাবু, মুলায়ম বাবু, জয়ললিতা এবং এই লিস্টের নবীন সংযোজন নবীন পট্টনায়ক। শোনা যাচ্ছে সি পি এম বাবুলাল মারান্ডিকেও এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিল খাইয়েছে। সেই কারণে এবার কোনও আঞ্চলিক দলই তার এলাকায় কাউকে সীট বেশি ছাড়তে রাজি হচ্ছে না। মুলায়মের সঙ্গে কংগ্রেসের ইউপিতে গন্ডগোল হয়েছে; লালু-পাশোয়ানের সঙ্গে গন্ডগোল হয়েছে বিহারে, শিবুর সঙ্গে হয়েছে ঝাড়খন্ডে; পাওয়ারের সঙ্গে হয়েছে মহারাষ্ট্রে। বাম দলগুলি সাড়ে চার বছর কংগ্রেসের সঙ্গে ঘর করলেও তারা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে একটি সীটও ছাড়েনি। সেটা সম্ভব নয় বলেই তারা ছুঁতো করে কংগ্রেস সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে। কংগ্রেসকে গালাগাল দেওয়ার সুবিধার জন্য। ইতিমধ্যে সিপিএম তাদের ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে কংগ্রেস সরকারকে গালাগাল দেওয়া শুরুও করে দিয়েছে। কংগ্রেস সরকার ৪½ বছর যা করেছে তার দায় তো বাম দলগুলিরও; কিন্তু বামদলগুলি নৈতিকতার কোনও ধার কোনওদিনই ধারে না। এবারও ধারেনি। তবে এটাও ঠিক ভোটের পরে কম পড়লে সীট ধার দিয়ে কংগ্রেসকে সরকার গড়তে সাহায্য করবে সিপিএম সেটা নিশ্চিত। কেননা সিপিএম একবারও বলছে না কংগ্রেসকে তারা কোনও অজুহাতেই সমর্থন করবে না। তখন তারা সেই পুরানো ধুয়া তুলবে "সাম্প্রদায়িক বিজেপি'কে রুখতে আমরা এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলাম"। কিন্তু তখন মমতার কি হবে। সি পি এম সমর্থিত কংগ্রেস দলে তারা কি যোগ দেবে? না, সমর্থন করবে? বিজেপি জোটে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বিনা অপরাধে শুধুমাত্র মুসলমানদের তোষণ করতে তিনি বিজেপি'র সঙ্গে যে বেইমানি করেছেন, বিজেপি'র উচিৎ নয় তাকে জোটে নেওয়া। তিনি শুধু বিজেপি'কে নয় গোটা হিন্দু জাতিকে অপমান করছেন। তার শাস্তি হওয়া উচিৎ।

গত ২০০৪'এর লোকসভা ভোটে সি পি এম পেয়েছিল ৪৩টি সীট, পাওয়ারের দল পেয়েছিল ৯টি, মায়াবতীর দল পেয়েছিল ১৯টি, নাইডুর এবং জয়ললিতার দল বোধ হয় একটিও পায়নি। দেবেগৌড়ার দলের অবস্থাও তথৈবচ। সিপিএম তার এই ৪৩টি লেজ নিয়েই নাড়াচ্ছে আর এই ছোট ছোট দলের নেতাদের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এরা যদি এবার দ্বিগুণ সীটও পায় তাহলেও কি তারা একক ভাবে সরকার গড়তে পারবে। কমিউনিস্টরা দেশে অস্থিরতা চায়। তৃতীয় ফ্রন্টের নাম করে এই অস্থিরতার বিরুদ্ধেই মানুষকেই ভোট দিতে হবে।

কোনও আঞ্চলিক দলকে নয়। ভোট দিন শুধু জাতীয় দল দুটিকে।

জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বহীন বাতিলদের একজোট করে তাঁদের নিয়ে গড়ে তুলেছে একটি গোষ্ঠী, নাম দিয়েছে তৃতীয় ফ্রন্ট। প্রথম থেকেই এরা তৃতীয় সেজে বসে আছে।

কেরলে হিন্দু মন্দির থেকে টাকা আদায় করছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেরলের সিপিএম সরকার এখন বেছে বেছে হিন্দুর মঠ-মন্দিরে পুজো-পার্বনে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করছে। বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, কেরলে খৃস্টান ও মুসলিমদের উৎসবে কোনওরকম লোডশেডিং হয় না। সম্প্রতি বড়দিন ও বরকত উৎসবে এমন চিত্রই নজর এসেছে। অথচ হিন্দুর পূজা-পার্বনে শুধু লোডশেডিং নয়, বৈধ বিদ্যুতের টাকাও অবৈধভাবে আদায় করছে বিদ্যুৎ পর্ষদ। সম্প্রতি সাবরিমালা মন্দিরের ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বম্ বোর্ডকে বিদ্যুৎ বিল হিসাবে ৩ কোটি টাকা দিতে হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরকে। কেরলের বিদ্যুৎ পর্ষদের বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটের জন্য ধার্য দাম ৪ টাকা, যেখানে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে দাম নেওয়া হয়েছে প্রতি ইউনিট পিছু ১৬ টাকা হিসাবে। কেরলের বামফ্রন্ট শাসনাধীন বিদ্যুৎ পর্ষদ একপ্রকার জোর করেই বিদ্যুতের মাশুল বাড়িয়ে মন্দির থেকে টাকা তোলার সহজ রাস্তা হাতে নিয়েছে।

স্বস্তিকা
নববর্ষ সংখ্যা
১৪১৬

দিন যায়, রাত্রি আসে-
তবে দুঃস্বপ্নের রাত্রি
গরু-পাচার থেকে ভরু-পাচার
নিরুদ্দেশ থেকে অনুপ্রবেশ
সন্দেহ থেকে সন্ত্রাস

প্রকাশিত হবে
১৩ এপ্রিল '০৯

পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামগুলি আজ আর ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় নয় হিন্দুদের কাছে। কেন? হিন্দু সংগঠনগুলোই বা কীভাবে বল ভরসা জোগাচ্ছে — কেবল আলোচনার বিশ্লেষণ নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব, অন্তরের অনুভব —

"সীমান্তের গ্রাম"

সব মিলিয়ে এক সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা

।। রঙিন প্রচ্ছদ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।।

দাম ছয় টাকা। ৩১ মার্চের মধ্যে এজেন্টরা কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com